মেঘদূত

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত কবি-পরিচয় ও দেশ-পরিচয় সমন্বিত এবং
অরুণাভ সেনগুপ্ত সংকলিত

প্রাপ্তিস্থান
সা হি ত্য লো ক
৩২/৭ বি ড ন স্ট্রী ট। ক ল কা তা ৬

প্রণতি

জগতের সেরা কবি **কালিদাস**, ভারতের কবি-মালার মণি,
ভারতের প্রেমে যেবা ভরপুর, যে-কবি প্রণয়-স্বষমা-খনি,
ক্ষেম-শান্তির অমৃত ধারার উৎস যে-কবি স্নিগ্ধ-ভাতি,
কাব্যে যাহার রয়েছে বাঁচিয়া অতীত ভারত, ভারত-জাতি,—
সেই কালিদাসে বুঝিলে বোঝালে, হে **রবি**, তাহারি প্রতিভূ তুমি,
ভাব-ভাণ্ডার খুলিয়া তাহার মুগ্ধ করিলে বঙ্গভূমি।
কালিদাসে আজ প্রণতি জানায়ে, তোমারেও, রবি, জানায়ে নতি,
পর্ণের পুটে এনেছি বহিয়া কালিদাস-স্থধা সভয়ে অতি।

আমার কবি-জীবনে

প্রীতি- ও উৎসাহ-দাতা

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কথাশিল্পী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-স্রষ্টা-দ্বয়ের

উদ্দেশে

শ্রদ্ধার অর্ঘ্য

শুদ্ধ কবি প্যারীমোহন

স্বর্গত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ছিলেন আমার পিতৃবন্ধু। উপরন্তু তাঁর সহকর্মী। কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে আমার পিতৃদেব ইংরেজি পড়াতেন, আর প্যারীমোহন ছিলেন বাংলার অধ্যাপক। ছোটবেলা থেকেই তাঁকে চিনি। আমরা তাঁকে কাকাবাবু বলতুম। ম্যাট্রিক পাশ করে যখন বঙ্গবাসী কলেজের আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হই, তখন তাঁর কাছে বাংলার পাঠ নেবার সৌভাগ্য হয়। প্রধানত তিনি কবিতাই পড়াতেন। অক্ষয় বড়ালের 'মানব-বন্দনা' কবিতাটি যে তিনি কত যত্ন করে পড়িয়েছিলেন, এবং কত দিক থেকে ওই কবিতার বক্তব্য, সেটা আজও ভুলিনি। নিজে ছিলেন শক্তিমান কবি। সম্ভবত সেই কারণেই কবিতার যা মর্মবাণী, তা নিষ্কাশন করা ও অন্যদের বুঝিয়ে বলা তাঁর পক্ষে কঠিন হত না। তাঁর ক্লাস করা ও কবিতা-বিষয়ে তাঁর কথা শোনা সেই ছাত্রজীবনে আমার এক মস্ত আনন্দের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

আমিও যে একটু-আধটু কবিতা লিখবার চেষ্টা করি, এটা জানবার পরে তিনি নিজে একদিন আমাদের কলকাতার বাসাবাড়িতে এসে তাঁর অনূদিত 'মেঘদূত'-এর একটি কপি উপহার দিয়ে যান। সংস্কৃতের উচ্চারণ-পদ্ধতি আর বাংলার উচ্চারণ-পদ্ধতি এক নয়। ফলে, সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দকে বাংলায় চালাই করা অতি কঠিন ব্যাপার, অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। সম্ভবত সেই কারণেই প্যারীমোহন শরণ নিয়েছিলেন সাত-মাত্রার কলাবৃত্তের।

(এ যখনকার কথা বলছি, কলাবৃত্তকে তখন মাত্রা-বৃত্ত বলা হত।) তাতে এক দিকে যেমন মন্দাক্রান্তার আন্দাজ অনেকটাই মেলে, অন্য দিকে তেমন অনুবাদও হয়ে ওঠে যৎপরোনাস্তি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। সম্ভবত এই সাবলীলতার কারণেই প্যারীমোহনের 'মেঘদূত' আমার আস্তমন্ত মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল।

অনুবাদ ছাড়া তাঁর মূল কবিতাও তখন অনেক পড়েছি। 'মেঘদূত' তো উপহার হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল, 'অরুণিমা' ও 'কোজাগরী' সংগ্রহ করি নিজে নিজে উদ্যোগী হয়ে। প্যারীমোহনের কবিসত্তার সঙ্গে আমার পরিচয় তাতে আরও ঘনিষ্ঠ হয়। বুঝতে পারি, তিনি একজন সত্যিকারের শুদ্ধ কবি।

শৈশবে ও প্রথম-যৌবনে যে এই শুদ্ধ কবির সান্নিধ্য পেয়েছিলুম, একে আমার বিরাট ভাগ্য বলে মানি। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি যে আবার নূতন করে প্রকাশিত হতে চলেছে, এটা সৌভাগ্যের কথা কাব্যানুরাগী পাঠক সমাজের পক্ষে। কবিপুত্র শ্রীঅরুণাভ সেনগুপ্ত তাঁর স্বর্গত পিতৃদেবের গ্রন্থগুলিকে প্রকাশ করবার যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নিবেদন

মেঘ যেমন বিরহ-সন্তপ্ত যক্ষের বেদনা-বাণী অলকায় বিরহিণী যক্ষ-প্রিয়ার নিকট বহন করিয়া লইয়া গিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল, আমিও তেমনি রসস্রষ্টা ও কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের কবিত্ব সুধা বাঙ্গলার রস-পিপাসু পাঠকগণের নিকট বহন করার সৌভাগ্য লাভের চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'পঞ্চপুষ্প' মাসিক পত্রে আমার মেঘদূত-অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই অনুবাদ বহু স্থলে পরিবর্তিত করিয়া বর্তমান অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। ইহাকে প্রায় নূতন অনুবাদ বলা চলে।

মেঘদূতে কালিদাসের মন্দাক্রান্তা ছন্দ ব্যবহারের বিশেষ অর্থ আছে। মন্দাক্রান্তা ছন্দই যেন বেদনার যথার্থ বাহন। এই ছন্দের গুরু গম্ভীর ধ্বনি ও বিরহ ভার মন্থর গতি-ভঙ্গী যক্ষের অন্তর-বেদনাকে যথার্থ বর্ণিত করিয়া তুলিয়াছে। অনুবাদে এই ছন্দের অনুসরণ না করিলে যক্ষের বেদনাকে যথার্থ ব্যক্ত করা যাইবে না, অর্থাৎ কালিদাসের মন্দাক্রান্তা ছন্দ ব্যবহারের সার্থকতা অস্বীকার করা হইবে। সেইজন্য আমি মন্দাক্রান্তার মাত্রা ও ধ্বনি অনুবাদের ছন্দে যথাসাধ্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে অনুবাদ সম্বন্ধে বহু স্নেহপূর্ণ

নির্দ্দেশ-উপদেশ দান করিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহ-প্রদত্ত একটি মেঘদূত-পরিচয় আমার গ্রন্থের প্রথমেই দেওয়া হইল। তাঁহার এই স্নেহের ঋণ পরিশোধ করিতে পারি এমন সামর্থ্য আমার নাই।

কাব্যরসিক ঐতিহাসিক বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন অনুবাদের উন্নতি-সাধনে আমাকে অক্লান্ত সহায়তা করিয়াছেন। কালিদাসের জীবন কথা, মেঘদূতের ছন্দ, পাঠান্তর, কাব্য-রূপ, কাব্য-প্রসঙ্গ, দেশ-সংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে তিনি এই পুস্তকের গোড়ায় ও শেষে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। মেঘের গমন-পথের মানচিত্রও তাঁহারই ঐতিহাসিক গবেষণা-প্রসূত। ১৩২৯ সালে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত বাঙ্‌লা ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধগুলি যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার প্রকৃষ্ট রসজ্ঞতার সহিত পরিচিত আছেন। যাহা হউক, তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিশ্রমের প্রতিদানে তাঁহাকে গভীর প্রীতি জানাইতেছি।

এই পুস্তকে রঙীন ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী; কালো ছবিগুলি আঁকিয়াছেন প্রসিদ্ধ শিল্পীদ্বয় শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দাশগুপ্ত। খুব ছোট ছোট ছবি কয়টি স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্রের অঙ্কিত। ইহাদের সকলের নিকটেই আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কলিকাতা
মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৩৭

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

দ্বিতীয় নিবেদন

মেঘদূতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণে ইহা যে-সব সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের প্রীতি ও স্নেহের ধারায় অভিষিক্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁহাদের সুগভীর প্রীতি আমাদের প্রচেষ্টা ধন্য করিয়াছে। আজ অগ্রজোপম চারুচন্দ্র পরলোকে। তাঁহার উল্লেখ প্রসঙ্গে হৃদয় শোকে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। যাহা হউক, এই দুই স্নেহপরায়ণ ব্যক্তির অভিমত এবং আরও কয়েকটি অনুকূল অভিমত পুস্তকের শেষ দিকে ছাপা হইল।

বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত মেঘদূতের পাঠের যে কিছু কিছু সংস্কার এই গ্রন্থে করা হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট ঐতিহাসিক ভিত্তি ও প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুসরণেই করা হইয়াছে। সে সংস্কার আমাদের খেয়াল খুশী অনুসারে করা হয় নাই। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন এ বিষয়ে যে একটি ক্ষুদ্র বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন তাহার নিরসন করিয়াছেন "মেঘদূতের পাঠ-সংস্কার" নামক নিবন্ধে। তাহা এই সংস্করণে ছাপা হইল। সুতরাং সে-বিষয়ে আমি অধিক কিছু না বলিয়া কেবল সুধী পাঠকের দৃষ্টি সেই নিবন্ধের দিকে আকৃষ্ট করিতেছি।

এই সংস্করণে বন্ধু প্রবোধচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধাদির বহু স্থলে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধন করিয়াছেন। মানচিত্রও কিছু সংশোধিত হইল। আমি অনুবাদেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন

করিয়াছি।

নবীন শিল্পী শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেনগুপ্তের অঙ্কিত তিনখানি বড় একরঙা ছবি এবারের গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির আশায় সংযোজিত করা হইল। নবীন শিল্পীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

ইহা ছাড়া সামান্য আরও কিছু শিল্প শোভাবর্দ্ধনের চেষ্টা এবারে করা হইয়াছে। পুস্তক বাক্সে ভরিয়া দিবার রীতি এবারে বর্জ্জন করা হইল।

পুস্তক নির্ভুল করিবার বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও দুই-একটি ছাপার ভুল রহিয়া গেল,—যথা, পূর্ব্বমেঘ, ৪২ শ্লোক, দ্বিতীয় চরণে 'স্তনিত' স্থলে 'ধ্বনিত' হইবে, এবং উত্তরমেঘ, ২৯ শ্লোক, তৃতীয় চরণে 'ছাদয়ন্ত্যাং' স্থলে 'ছাদয়ন্তীং' হইবে। ভরসা করি, পাঠকেরা এই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

কলিকাতা,
২৬ ফাল্গুন, ১৩৪৫

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

মেঘদূত-পরিচয়

মেঘদূতকে অলঙ্কার-শাস্ত্রে খণ্ডকাব্য বলে ; ইংরেজরা লিরিক বলেন। কোনটী সত্য ? খণ্ডকাব্য,—অর্থ যতদূর বুঝা যায়,—টুকরা কাব্য বলিয়াই বোধ হয় ; টুকরা কাব্য বলিয়া মেঘদূতের উল্লেখ করিলে জিনিসটার অবমান করা হয়। মেঘদূত টুক্‌রা নহে—পূরা, সর্ব্বাঙ্গে সুশোভিত, সম্পূর্ণ এবং অপ্রমেয়। সুতরাং মেঘদূত টুকরা কাব্য নহে। ছোট কাব্য বলিতে চাও বল। দৈর্ঘ্যে ছোট, কিন্তু ফলে ছোট নয়। কিন্তু খণ্ড বলিতে ত ছোট বুঝায় না ! লিরিক্ বলিলে যাহা বুঝায়, উত্তর মেঘে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে ; কিন্তু তথাপি উত্তর-মেঘকে লিরিক্ বলা যায় না। কারণ উহা গানে লিখিত নহে। লিরিক্ গান না হ'লে হয় না, কাব্যের বাহ্য আকার লইয়াই লিরিক্। তবে উৎকৃষ্ট লিরিকের যে ভাব-তন্ময়তা আছে, উত্তর-মেঘে সেইরূপ ভাব-তন্ময়তা আছে বলিয়া উহাকে লিরিক্ বলিতে ইচ্ছা কর, বলিতে পার। কিন্তু পূর্ব্ব-মেঘের অবাধ কল্পনার রমণীয় সৃষ্টিকে লিরিক্ বলিবে কিরূপে, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। তবে যদি কেহ বলে, খণ্ড শব্দের অর্থ খাঁড় গুড়,—তখনকার প্রধান মিষ্ট সামগ্রী ; আমাদের রাজারা মনোহরা ; তন্ময়-কাব্য খণ্ডকাব্য ; তাহা হইলে কতক রাজী আছি। সেকালে খণ্ড শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নৈষধকার খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য রচনা করেন। ষষ্ঠে ব্রহ্মগুপ্ত জ্যোতিষে খণ্ড-খাদ্য রচনা করেন। আমরা এখন যেমন বলি

অমিয়-নিমাই-চরিত তেমনি সেকালে খণ্ড-কাব্য অথে মধুময় অমৃতময় কাব্য। টুকরা বলিলে জমে না।

আমি বলি, মেঘদূতের মত একখানা মহা-মহা-কাব্য আর রচনা হয় নাই। মহাকাব্যে নূতন সৃষ্টি অনেক থাকে, কিন্তু সে কি সৃষ্টি? এই পৃথিবী, এই আকাশ, এই মানুষ, এই মনুষ্য-চরিত্র, এই গাছ, এই পালা—এই সব—তবে সাজান-গোজান নূতন করিয়া। না হয় একটা দু'টা মানুষ নূতন করিয়া গড়া। কিন্তু মেঘদূতে সব নূতন সৃষ্টি,—পৃথিবী, গাছ-পালা, বন, জঙ্গল, স্ত্রী, পুরুষ, সমাজ, সামাজিক, সব ছাড়িয়া নূতন সৃষ্টি। (মেঘদূত এক অদ্ভুত নূতন সৃষ্টি; সৃষ্টিছাড়া বলিতে চাও বল। অলকা এক নূতন সৃষ্টি।) এত বড় ভারতবর্ষটা, ইহাতে কালিদাসের কুলাইল না। তিনি ভারতবর্ষ ছাড়া অনেক দেশ জানিতেন। পারস্য জানিতেন, যবনদেশ জানিতেন, যে-সকল দ্বীপ হইতে লবঙ্গ-পুষ্প কলিঙ্গে আনীত হইত, তাহাও জানিতেন; এসকল দেশে তাঁহার পছন্দমত জায়গা পাইলেন না। তাই তিনি হিমালয়ের তুঙ্গতম শৃঙ্গে—মনুষ্যের অগম্য—কেবল তাঁহার কল্পনামাত্রের গম্য—স্থানে অলকা নগর বসাইলেন। তাঁহার নগরে পার্থিব নগরের নিয়মাবলী খাটিবে না। তাঁহার নগর তিনি যত ইচ্ছা সুখময়, আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারিবেন। আর সেই

নগরে যাহারা বাস করিবে, তাহারাও কল্পনা রাজ্যের লোক, মানুষ তাহাদিগকে দেখে নাই, দেখিবেও না। তাহাদের সমাজনীতি, শাসন-প্রণালী, সব নূতন। সব কালিদাসের অবাধ কল্পনার অমৃতময় ফল।

মেঘদূতে সমস্ত জড় পদার্থই চৈতন্যময়। মেঘ চেতন, রামগিরি চেতন, আম্রকূট চেতন, নর্ম্মদা চেতন; বেত্রবতী, নির্ব্বিন্ধ্যা, গম্ভীরা, গন্ধবতী—সবই চেতন। নদীগুলি বিশেষ চৈতন্যময়, প্রেমময়, প্রেমোন্মাদময়। কালিদাস প্রতি কথায় তাহাদের চৈতন্য, বুদ্ধি ও হৃদয় দেখাইয়াছেন; তাহারা সকলেই মেঘের প্রেমে আকুল। এইরূপে কালিদাস রামগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া অলকা পর্যন্ত সমস্ত জড় জগৎকে চৈতন্যময় করিয়াছেন; যেন এই সমস্ত স্থানের নদ, নদী, পর্ব্বত, কন্দর, ভূচর, খেচর, জলচর, এমন কি পুঁটী মাছটী পর্য্যন্ত যক্ষের দুঃখে দুঃখী—যক্ষের বিরহে কাতর। যক্ষের দূত হইয়া মেঘ অলকায় যাইতেছে; সকলে মিলিয়া মেঘকে খুসী করিবার চেষ্টা করিতেছে; কেহ শিখরে স্থান দিতেছে; কেহ অট্টালিকার অগ্রদেশে ধারণ করিতেছে; কেহ জল দিয়া উহার দেহে বল জন্মাইয়া দিতেছে; কেহ বা জল বাহির করিয়া উহার গতি-লাঘব সম্পাদন করিতেছে। সমস্ত জড় জগতে যেন কেমন একটা একপ্রাণতা জন্মিয়া গিয়াছে। মেঘটী যক্ষের প্রাণ—মেঘ যাইতেছে,

আমরা যেন দেখিতেছি যক্ষের প্রাণই ছুটিতেছে ; আর যাহা কিছু দেখিতেছে আপনার উপযোগী করিয়া- আপনার করিয়া লইতেছে ; আপনার প্রাণের সহিত—প্রেমময় আবেশময় ভাবের সহিত মাখিয়া লইতেছে। তাই জড়ের এত সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে।

মেঘদূত লইয়া যতই আন্দোলন করি, উহার অসীম সৃষ্টি-নৈপুণ্য, উহার ভাবময়, চৈতন্যময়, উচ্ছ্বাসময়, আবেগময় কবিত্ব-লহরী যতই মনোমধ্যে গ্রথিত হয়, ততই উহাতে কালিদাসের অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তির বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হই।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কালিদাস ও মেঘদূত

কবি পরিচয়।—ভারতবর্ষে আর যা কিছুই অভাব থাকুক না কেন, কবি ও কাব্যসাহিত্যের অভাব কখনই ছিল না। বৈদিক ঋষি-কবি এবং ব্যাস বাল্মীকির যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোনো সময়েই কাব্য-রসচর্চার প্রতি বিরাগ দেখা যায় নাই। কত কবি যে ভারতবর্ষের সর্বত্র যুগে যুগে কত কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তার হিসাব লইতে গেলে অবাক্ হইতে হয়। কিন্তু এই অসংখ্য কবিদের মধ্যে অধিকাংশেরই কবি-প্রতিভা নিজেদের প্রাদেশিক সীমা ও তৎকালের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। যে কয়জন মহাকবি কবিত্ব-মাধুর্যে সমগ্র ভারতবর্ষকে মুগ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন ও যাঁদের কাব্য তৎকালীন যুগের সীমা অতিক্রম করিয়া চিরন্তনতা অর্জন করিয়াছে, তাঁদের মধ্যে কালিদাসই শ্রেষ্ঠ,—একথা ভারতের অলঙ্কারিক-সমাজে ও কবি সমাজে চিরকাল একবাক্যে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। মহাভারত ও রামায়ণ এই দুইটি সর্বজনীন মহাকাব্যের কথা ছাড়িয়া দিলে একথা না মানিয়া উপায় নাই যে, কালিদাসের কাব্যগুলি ভারতবর্ষের হৃদয়কে যেরূপ নিবিড় ও চিরন্তন রূপে জয় করিয়া লইয়াছে সেরূপ আর কোনো কবির কাব্যই পারে নাই। কালিদাসের কাব্য-সাহিত্যের জয় যাত্রা শুধু ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই ; ভারতের সীমা লঙ্ঘন করিয়া বিশ্বহৃদয়-জয়ের অভিমুখেও তার অভিযান চলিয়াছে। এখন হইতে বহু শতাব্দী

টা।-- .

পূর্বোক্ত কালিদাসের মেঘদূত একদিকে সিংহলী ভাষায় ও অপর দিকে তিব্বতী ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া সিংহল ও তিব্বতের হৃদয় হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, আর বর্তমান যুগেও "য়ুরোপের কবিকুলগুরু গেটে"র সময় হইতে এখন পর্যন্ত বিশ্বসাহিত্য-সমাজে কালিদাস ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির আসন পাইতেছেন। ইহা হইতেই বোঝা যায়, কালিদাস বিশেষ ভাবে ভারতের কবি হইলেও তাঁর বিশিষ্ট ভারতী-সাধনা সর্বকালীন ও সর্বজনীন ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু ভারতের এই মহাকবির ব্যক্তিগত পরিচয়ের ইতিহাস ভারতবর্ষ কি ভাবে রক্ষা করিয়াছে তার সন্ধান করিতে গেলে হতাশ হইতে হয়। ভারতবর্ষ যেমন নিজের জাতীয় জীবনের সুখ-দুঃখ, লজ্জা-গৌরব ও উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত রাখে নাই, তেমনি কবি, মনীষী মহাপুরুষদের জীবন-চরিত রক্ষার প্রতিও তার ঔদাসীন্যের সীমা নাই। তার কারণ যা-ই হোক না কেন, এইজন্যই কিন্তু আজ কালিদাসের জীবন-বৃত্তান্ত দূরে থাকুক, সমস্ত জীবনের মধ্যে একটি ঘটনাও সংক্ষেপে জানিবার উপায় নাই। কালিদাসের কাল এবং জন্মভূমি লইয়া যে-তর্কজালের সৃষ্টি হইয়াছে তাতে সাহিত্যক্ষেত্র আকীর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু কোনো নিঃসংশয় ও সুনির্দিষ্ট মীমাংসা এখনও হইল না। তথাপি এ বিষয়ে পণ্ডিত মহলে যে কয়টি

সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে সংক্ষেপে তারই পুনরুল্লেখ করিতেছি।

কালিদাসের কাল নির্ণয়ের সমস্যার কথাই আগে উঠে। কালিদাস যে-যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন প্রথমেই তার ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সীমা নির্দেশ করিয়া পরে তাঁর বিশিষ্ট সময়টি নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। কালিদাস যে তিনটি নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন তার মধ্যে মালবিকাগ্নিমিত্র অন্যতম। এই নাটকে নায়ক অগ্নিমিত্র উত্তর ভারতের সুবিখ্যাত বৈদিক বা শুঙ্গ বংশীয় সম্রাট পুষ্যমিত্রের পুত্র। পুষ্যমিত্র খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে (১৮৫-১৪৯) রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্রকে যখন কালিদাস উক্ত নাটকের নায়করূপে গ্রহণ করিয়াছেন তখন কালিদাস যে পুষ্যমিত্র হইতে অন্তত এক শতাব্দী পরবর্তী তাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং কালিদাসের আবির্ভাব কালের ঊর্ধ্বতন সীমা খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী। দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর জিলার অন্তর্গত ঐহোলি গ্রামে কবি রবিকীর্তি রচিত একটি প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। এই প্রশস্তিটি দাক্ষিণাত্যের চালুক্য-সম্রাট দ্বিতীয় সত্যাশ্রয়-পুলকেশীর রাজত্বকালে (৬১০-৬৪২) ৫৫৬ শকাব্দে অর্থাৎ ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। রবিকীর্তি কালিদাস ও ভারবিকে প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধনের (৬০৬-৬৪৭) সুপ্রসিদ্ধ সভাকবি বাণভট্টের হর্ষচরিতেও একজন যশস্বী কবি বলিয়া কালিদাসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং কালিদাস খৃষ্টীয় ষষ্ঠ

শতকের পরবর্তী হইতে পারেন না। কালিদাস সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যে-সমস্ত জনবাদ প্রচলিত আছে তার মধ্যে সব-চেয়ে প্রবল মত এই যে, তিনি উজ্জয়িনীর সুবিখ্যাত রাজা শকারি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন। এই জনবাদের মতে উক্ত বিক্রমাদিত্য রাজাই খৃষ্ট-পূর্ব ৫৭ অব্দ হইতে প্রচলিত বিক্রম-সংবতের প্রতিষ্ঠাতা ; সুতরাং কালিদাস ও খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের লোক। কিন্তু বিক্রমাদিত্য কোনো রাজার নাম নয়, উপাধিমাত্র, এবং এই উপাধিধারী বহু রাজাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে রাজত্ব করিয়াছেন ; খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে কোনো বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন এমন কোনো সংশয়াতীত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দ হইতে প্রচলিত সংবতের আদি নাম "কৃত," বিক্রমসংবৎ নয় ; বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে আদিতে ওই সংবতের কোনো যোগই ছিল না ; পরবর্তীকালে জনবাদ ঐতিহাসিক ভ্রান্তিবশত ওই বর্ষ-গণনার সহিত বিক্রমাদিত্যের নাম জুড়িয়া দিয়াছিল। জনশ্রুতি-মতে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার নয়টি রত্নের নাম যথাক্রমে—ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি। কালিদাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও অপর আট রত্নের মধ্যে একমাত্র বরাহমিহির ব্যতীত আর কারও কাল নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না ; কিন্তু তাদের মধ্যে

একজনকেও খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের লোক বলিয়া মনে করার কোনো হেতু নাই। পক্ষান্তরে বরাহমিহির যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের লোক (৫০৫-৫৮৭) সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং এই নবরত্নকে সমকালীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও কালিদাসকে খৃষ্টপূর্ব শতকে ফেলা যায় না। কিন্তু আসল কথা এই যে, এই নবরত্নকে সমকালীন বলিয়া মনে করিবারই কোনো হেতু নাই, বিখ্যাত অমরকোষ-প্রণেতা অমরসিংহকে কালিদাসের পরবর্ত্তী কালের লোক বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে। তা ছাড়া বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভা সম্বন্ধে এই প্রবাদটির সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামে একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক (সম্ভবত খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত) জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থে ; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোনো গ্রন্থে নবরত্নের উল্লেখমাত্রও নাই। সুতরাং কালিদাসের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে নবরত্ন-সভার প্রবাদের উপর যে বিন্দুমাত্রও নির্ভর করা যায় না, একথা অতি সুস্পষ্ট।

অতএব কালিদাসের কালনির্ণয় করিতে অন্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এস্থলেও কালিদাসের নিজের কাব্যে উল্লিখিত তৎকালীন ভারতীয় অবস্থা ও অন্যান্য কবিদের সহিত তাঁর ভাব ও ভাষার তুলনা, এই আপেক্ষিক প্রমাণের চেয়ে দৃঢ়তর কোনো প্রমাণ নাই। অশ্বঘোষ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষাংশ বা দ্বিতীয় শতকের পূর্ব্বাংশের একজন

প্রতিভাবান্ কবি ও নাট্যকার। মহাকবি ভাসের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু তিনি যে কালিদাসের পূর্ব্বগামী সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কালিদাস নিজেই মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে নামোল্লেখ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ভাস যে অশ্বঘোষের পরবর্ত্তী সে-বিষয়েও সন্দেহ করা চলে না। সুতরাং ভাস খৃষ্টীয় তৃতীয় কি চতুর্থ শতকের লোক, পণ্ডিতেরা এরূপ মনে করেন। অতএব কালিদাস সে সময়েরও পরবর্ত্তী লোক, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নয়। কালিদাসের কাব্যে কামশাস্ত্রের প্রভাব লক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু কামসূত্র-প্রণেতা মল্লনাগ বাৎস্যায়ন কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী তা এখনও তর্কের বিষয়, যদিও খৃষ্টীয় তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতকের মধ্যে কোনো সময়ে মল্লনাগ আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে পারে। পশ্চিম মালবের অন্তর্গত মন্দশোর নামক স্থানে একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে; উহা ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে (৫২৯ সংবৎ) বৎসভট্টি নামে কোনো কবি রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রশস্তিটিতে কালিদাসের কাব্যের, বিশেষত মেঘদূতের, সুস্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে বলিয়া ম্যাক্‌ডোনেল্, কীথ্ প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করেন। এই যুক্তিগুলির উপর নির্ভর করিয়া এই কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, কালিদাস খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। কালিদাসের কাব্য আলোচনা করিলে

নানা দিক্ হইতে এই অনুমানেরই সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যসমূহে দেশব্যাপী যে শান্তি ও ঐশ্বর্য্যশালিতার আভাস পাওয়া যায় একমাত্র গুপ্তরাজাদের আমলেই তা সম্ভব হইয়াছিল। তাঁর কাব্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের যে অভ্যুত্থান ও প্রভাবের পরিচয় পাই তাও গুপ্ত যুগের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়, বিশেষত মালবিকাগ্নিমিত্রে উল্লিখিত পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ ও সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধের কথা একই সঙ্গে মনে উদিত হয়। তা ছাড়া কালিদাসের কাব্য-সমূহে সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি অখণ্ড চেতনার সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে; গুপ্ত যুগের পূর্ব্বে সমগ্র ভারতের এরূপ অখণ্ড ঐক্যবোধ ভারতবাসীর মনে জাগিয়াছিল কি না সন্দেহ। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে কালিদাস বক্ষু (Oxus)-তীরে (পাঠান্তরে সিন্ধুতীরে) হূণদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও গুপ্তরাজত্ব সময়ে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের পূর্ব্বার্দ্ধের পক্ষেই বিশেষভাবে স্বাভাবিক। কুমারসম্ভবে একস্থানে জামিত্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এই শব্দটি একটি গ্রীক্ সংজ্ঞা হইতে উৎপন্ন এবং খৃষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতকের পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দের ব্যবহার সম্ভব নয়। যা হোক, কালিদাস যদি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমার্দ্ধের লোক হন তবে তিনি গুপ্তসম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১৪) ও তৎপুত্র কুমারগুপ্তের (৪১৫-৪৫৫) সমকালীন।

এস্থলে একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল বিক্রমাদিত্য এবং তিনিই ৩৮৮ খৃষ্টাব্দে বা তারপরে কোনো সময়ে উজ্জয়িনীর শকক্ষত্রপ বংশকে নির্মূল করিয়া উজ্জয়িনীকে গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। উত্তর ভারতের গুপ্তসম্রাটদের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। এই চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে উজ্জয়িনী গুপ্তসাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীরূপে পরিণত হইল। এই বিক্রমাদিত্যই কোনো কোনো স্থানে পাটলিপুরবরাধীশ্বর উজ্জয়িনীপুরবরাধীশ্বর বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং জনবাদ-বিশ্রুত কালিদাসের পৃষ্ঠপোষক উজ্জয়িনীরাজ শকারি বিক্রমাদিত্য ও এই চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি পণ্ডিতেরা কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের নামটির মধ্যে বিক্রমাদিত্য নামের প্রতি এবং কুমারসম্ভব কাব্যের নামের মধ্যে রাজপুত্র কুমারগুপ্তের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের আভাস পাইয়া থাকেন। রঘুর দিগ্বিজয়-কাহিনীর মধ্যেও তাঁরা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের প্রভাব দেখিতে পান এবং রঘুবংশের 'আসমুদ্রক্ষিতীশানাং' "কুমারকল্পং সুষুবে কুমারং" প্রভৃতি উক্তির মধ্যে তাঁরা সমুদ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত প্রভৃতি নামের প্রতিধ্বনি শুনিতে পান। এবিষয়ে আরেকটি মাত্র কথার প্রয়োজন। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্তের উপাধি ছিল মহেন্দ্রাদিত্য এবং কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্তের (৪৫৫-৪৬৭) উপাধি ছিল

বিক্রমাদিত্য। কেহ কেহ কালিদাসকে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সমকালীন মনে না করিয়া স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সমকালীন মনে করেন। কিন্তু এরূপ মনে করার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, রঘুবংশের উল্লিখিত হূণরা বক্ষু বা সিন্ধুতীরেই অবস্থিত ছিল, স্কন্দগুপ্তের সময়ে এরূপ উল্লেখ করার সার্থকতা থাকে না, কারণ হূণরা সে-সময় মধ্যভারত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি। দ্বিতীয়ত, কালিদাস যদি স্কন্দগুপ্তের সমকালীন হন তবে কবি বৎসভট্টির সময়ের সহিত তাঁর সময়ের বিশেষ ব্যবধান থাকে না, অথচ বৎসভট্টির সময় হইতে কালিদাস কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে, তা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

কালিদাসের জন্মভূমি ও জীবন কথা।—কালিদাসের জন্মভূমি লইয়াও বাক্-বিতণ্ডার অভাব নাই। আসল কথা এই যে, কালিদাস ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে জন্মিয়াছিলেন সে-বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। তবে বহু প্রচলিত জনবাদ মতে তিনি উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের সভা-কবি ছিলেন। কালিদাসের কাব্যেও (বিশেষত মেঘদূতে) আমরা উজ্জয়িনীর প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণের পরিচয় পাই। সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আমলে অন্তত কিছুকাল তিনি উজ্জয়িনীতে বাস করিয়াছিলেন, এমন মনে করা অসঙ্গত হইবে না। এর বেশি আর কিছুই বলা যায় না।

বিক্রমাদিত্য। কেহ কেহ কালিদাসকে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সমকালীন মনে না করিয়া স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সমকালীন মনে করেন। কিন্তু এরূপ মনে করার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, রঘুবংশের উল্লিখিত হূণরা বক্ষু বা সিন্ধুতীরেই অবস্থিত ছিল, স্কন্দগুপ্তের সময়ে এরূপ উল্লেখ করার সার্থকতা থাকে না, কারণ হূণরা সে-সময় মধ্যভারত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি। দ্বিতীয়ত, কালিদাস যদি স্কন্দগুপ্তের সমকালীন হন তবে কবি বৎসভট্টির সময়ের সহিত তাঁর সময়ের বিশেষ ব্যবধান থাকে না, অথচ বৎসভট্টির সময় হইতে কালিদাস কিছু পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে, তা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি।

কালিদাসের জন্মভূমি ও জীবন-কথা।—কালিদাসের জন্মভূমি লইয়াও বাক্-বিতণ্ডার অভাব নাই। আসল কথা এই যে, কালিদাস ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে জন্মিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। তবে বহু প্রচলিত জনবাদ মতে তিনি উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের সভা-কবি ছিলেন। কালিদাসের কাব্যেও (বিশেষত মেঘদূতে) আমরা উজ্জয়িনীর প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণের পরিচয় পাই। সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আমলে অন্তত কিছুকাল তিনি উজ্জয়িনীতে বাস করিয়াছিলেন, এমন মনে করা অসঙ্গত হইবে না। এর বেশি আর কিছুই বলা যায় না।

কালিদাসের কবি-জীবনে ছোট খাটো ঘটনাটিও জানিবার জন্য সকলের মনেই অসীম ঔৎসুক্য আছে। কিন্তু জাতির ইতিবৃত্ত ও মনীষীদের জীবন-বৃত্ত সম্বন্ধে ভারতবর্ষের যে অতুলনীয় উদাসীনতা ছিল, তার কৃপায় আমরা কালিদাসের জীবন সম্বন্ধে একটিমাত্র কথাও জানি না। কিন্তু তাই বলিয়া কাব্যরসচর্চায় অসমর্থ নিরক্ষর বা অল্পাক্ষর জনসাধারণও যে ভারতবর্ষের এই শ্রেষ্ঠতম কবির জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নিজেদের দুর্নিবার কৌতূহলকে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতে পারিয়াছিল, তা নয়। তারা প্রকৃত সত্য-বৃত্তান্তের অভাবে আপনাদের একান্ত ঔৎসুক্যের বশে অজ্ঞাতসারেই নিজেদের মন হইতে কবি কালিদাসের মানসী জীবন-বৃত্তান্ত রচনা করিয়া লইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য ও কালিদাসের মহত্ত্বে ভারতবর্ষ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল; তাই অচির কাল মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে পল্লীতে পল্লীতে অসংখ্য কালিদাস-কথা-কোবিদ গ্রামবৃদ্ধদের আবির্ভাব হইল। তাদের এই ঐকান্তিকতার ফলে ভারতবর্ষের আজ বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস সম্বন্ধে উপকথা-উপাখ্যানের অন্ত নাই। তাদেরই কৃপায় আমরা জানিতে পারি যে, কালিদাস বাল্যকালে এমনি নিরেট মূর্খ ছিলেন যে, গাছের শাখায় বসিয়া সেই শাখার মূল ছেদন করিতেও দ্বিধা করিতেন না, পরে কয়েকজন পণ্ডিতের ষড়যন্ত্রের ফলে কোনো বিদুষী রাজকন্যার সহিত কালিদাসের বিবাহ হয়;

সন্ত-বিবাহিতা বিদুষী বধূর নিকট উষ্ট্র উচ্চারণ করিতে একবার র ও একবার ষ লোপ করাতে অপমানিত ও বিতাড়িত হইয়া তিনি সরস্বতীর আরাধনা করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন ও পরে গৃহে ফিরিয়া পত্নীর অনুরোধে কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে আধুনিক পণ্ডিতেরা কালিদাস-কথা-কোবিদের এই সমস্ত কাহিনীকে নিরেট তথ্য বলিয়া স্বীকার করিতে মোটেই প্রস্তুত নন।

কালিদাসের কাব্য।—কালিদাসের বাস্তব জীবন সম্বন্ধে অতি অস্পষ্ট আভাস মাত্রও না পাইলেও কালিদাসের কবি-রূপের সঙ্গে পরিচয়-লাভের পক্ষে যথেষ্ট উপাদানই আমাদের আছে। তিনি আমাদের জন্য যে সাতখানি গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন তাতেই তাঁর কবি-মনের পূর্ণাঙ্গ ছবি অতি স্পষ্ট ও সুন্দররূপেই প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ রূপটি তার শ্রেষ্ঠ কবির মনের ভিতর দিয়া যে বিশেষ ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সেই বিশেষ রূপটির অখণ্ড পরিচয় বহন করে বলিয়াই কালিদাসের কাব্য শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত জগতের কাছেই এমন আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কালিদাসের কাব্যের রস-বৈশিষ্ট্য ও সেই কাব্যের ভিতর দিয়া ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ কিভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে

তার আলোচনার স্থান ইহা নয়।

কালিদাস কয়খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন সে-বিষয়ে সকলে এক-মত নয়। তবে তিনি যে মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ এই তিনখানা কাব্য এবং মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী ও অভিজ্ঞানশকুন্তল এই তিনখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে মতভেদ নাই। ঋতুসংহার নামক কাব্যটি ভারতবর্ষে চিরকাল কালিদাসের নামেই চলিয়া আসিয়াছে। ইদানীং কেহ কেহ এই কাব্যটি কালিদাসের কি না এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন, এই কাব্যটি যে কালিদাসের এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। পক্ষান্তরে নলোদয়, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গাররসাষ্টক প্রভৃতি কয়েকটি কাব্য এবং শ্রুতবোধ নামে একখানি ছন্দ-শাস্ত্রও কালিদাসের নামে চলিতেছে; কিন্তু আজকাল অনেকেই এগুলিকে কালিদাসের বলিয়া মানিতে প্রস্তুত নন।

উক্ত সাতখানি গ্রন্থের রচনার পৌর্বাপর্য্য সম্বন্ধেও কিছুই ঠিক্ করিয়া বলা যায় না। তবে কালিদাসের রচনার পরিণতি-ক্রম লক্ষ্য করিলে মনে হয় তিনখানি নাটকের মধ্যে মালবিকাগ্নিমিত্রই কালিদাসের প্রথম নাটক এবং অভিজ্ঞানশকুন্তল তাঁর পরিণত বয়সে লেখা। কাব্য চারখানির পর্য্যায়ক্রম সম্বন্ধেও মনে হয় যে, ঋতুসংহার কালিদাসের সর্বপ্রথম রচনা

এবং রঘুবংশ তাঁর শেষ কাব্য। মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের মধ্যে কুমারসম্ভবকেই অপেক্ষাকৃত পাকা হাতের লেখা বলিয়া বোধ হয়। এই প্রসঙ্গে আমার "মেঘদূত ও কুমারসম্ভব"—শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—বিচিত্রা, আশ্বিন, ১৩৩৮।

মেঘদূত।—কালিদাস খুব সম্ভবত ঋতুসংহারের পরেই মেঘদূত লিখিয়াছিলেন। কারণ, মেঘদূতে ঋতুসংহার অপেক্ষা নিপুণতর হাতের যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। পক্ষান্তরে কুমারসম্ভবে ও রঘুবংশে যেরূপ পরিণত বুদ্ধিবৃত্তির ছাপ রহিয়াছে মেঘদূতে সেরূপ নাই। মেঘদূত কবির মধ্য বয়সের রচনা বলিয়াই মনে হয়। তাই মেঘদূতেই সব-চেয়ে বেশী করিয়া পরিপূর্ণ যৌবনোচিত রচনা-শক্তি, হৃদয়-ঢালা ভাবাবেগ ও মুক্ত কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই কুমারসম্ভবে অবশ্য অধিকতর কল্পনাশক্তি এবং রঘুবংশে দৃঢ়তর রচনাশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু কুমারসম্ভব ও রঘুবংশে মেঘদূতের চেয়ে ভাবাবেগ অধিকতর সংযত এবং বুদ্ধিবৃত্তি অধিকতর সক্রিয়। তাই মেঘদূতের অবল্গিত ভাবাবেগ ও নিছক কল্পনাবৃত্তি কুমারসম্ভব ও রঘুবংশে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। এইজন্যই বোধ হয় ভারতবর্ষের নিছক রসপ্রিয় সমাজে মেঘদূতের এত আদর এবং এইজন্যই একথা বলা হইয়াছে যে, কালিদাস যদি শুধু মেঘদূত লিখিয়া আর কিছুই না লিখিতেন তথাপি তাঁর কবি খ্যাতি অক্ষুণ্ণই থাকিত। কিন্তু উচ্চতর

কাব্য-বিচারের আদর্শে কেহই বোধ করি মেঘদূতকে কুমারসম্ভব বা রঘুবংশের সমকক্ষ মনে করেন না।

তথাপি একথা অসঙ্কোচেই বলা চলে যে, কালিদাস যদি মেঘদূত না লিখিয়া শুধু কুমারসম্ভব ও রঘুবংশই লিখিয়া যাইতেন তবে সংস্কৃত সাহিত্য এবং কালিদাসের কবি-যশ উভয়ই অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। মেঘদূতে কবির যে রূপটি ধরা পড়িয়াছে কুমারসম্ভব কিংবা রঘুবংশে আমরা সে রূপটিকে আর পাই না। কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের রচয়িতা মহাকবি; মেঘদূতের রচয়িতাকে বলিতে পারি গীতি-কবি। মেঘদূতকে ঠিক লিরিক বলা যায় না; অথচ লিরিক বা গীতি-কবিতার মূলগত যা বিশেষত্ব—কবির ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাসকে চিরন্তনতার রূপ দিয়া প্রকাশ করা—মেঘদূতে তা যথেষ্টই আছে। কিন্তু মেঘদূতের যা বাহ্যরূপ তা মোটেই গীতি-কবিতার রূপ নয়; মেঘদূতকে যে পটভূমিকার উপর চিত্রিত করা হইয়াছে তা লিরিকে নয়, সেটা মহাকাব্যেরই ভূমিকা। গীতি-কবিতা ও মহাকাব্যের এই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণই মেঘদূতের অনন্যসাধারণ মনোহারিতার একটি কারণ।

কাব্য মাত্রেরই তিনটি রূপ আছে—বিষয় বা বস্তু রূপ, রস বা ভাব রূপ এবং ধ্বনিরূপ। গীতি-কবিতায় ভাবরূপই প্রধান ও প্রবল, ধ্বনি তারই অনুগমন করে, বিষয় উপলক্ষ মাত্র

হইয়া প্রচ্ছন্ন থাকে। অন্য কাব্যে ভাব ও ধ্বনিই একান্ত হইয়া উঠে না, বিষয়-বস্তুও ভাবের সমকক্ষতা লাভ করে। মেঘদূতে কিন্তু এই তিনটি রূপই সমান গতিতে প্রবল হইয়া চলিয়াছে। যক্ষের বিরহ-বেদনা ও মিলন-কামনাই তার ভাবরূপ ; মেঘদূতের এই ভাব রূপটিই একান্ত হইয়া মেঘদূতকে গীতি-কবিতার সুর দিয়াছে। অথচ মেঘদূতের বস্তুরূপ, মেঘের ভ্রমণকাহিনী ও অলকা-বর্ণনা কবির প্রধান উদ্দেশ্য নয়, একথাও বলা চলে না। এই বস্তুরূপই মেঘদূতকে মহাকাব্যের আসনে স্থাপিত করিয়াছে।

রস-বিচারের দিক্ হইতে মেঘদূতের অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এখানে সেইতত্ত্বের পুনরালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তার বস্তুরূপ ও ধ্বনি রূপ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা অসঙ্গত হইবে না। মেঘদূতের বস্তুরূপের পরিচয় দিতে গিয়া তার আখ্যান ও বর্ণনার পুনরুল্লেখ করিতে চাই না। বিষয়-বস্তুর বিশ্লেষণ করিলে মেঘদূতের দুইটি স্বতন্ত্র রূপ দেখিতে পাই ; প্রথমত রামগিরি হইতে অলকা পর্য্যন্ত মেঘের পথ-রেখাকে উপলক্ষ্য করিয়া দশার্ণ, অবন্তি প্রভৃতি তৎকালীন জনপদসমূহের বর্ণনা ; দ্বিতীয়ত অলকা ও বিরহিণী যক্ষ-প্রিয়ার বর্ণনা। বিষয়-বস্তুর এই দুইটি রূপই মেঘদূতকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে। মেঘদূতে যদি এই দুইটি বিষয়রূপ না থাকিত, কালিদাস যদি যক্ষ-প্রিয়ার বিরহ বর্ণনা করিয়া এবং যক্ষকে দিয়া

মেঘের নিকট তার প্রণয়-বার্তা বহনের অনুরোধ করাইয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তবে মেঘদূতের প্রায় সমস্ত গৌরবটুকুই অন্তর্হিত হইয়া যাইত এবং মেঘদূত একটি অত্যন্ত সাধারণ কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। মেঘদূতের বিষয়-বস্তুর এই দুইটি রূপ ভারতবর্ষে বহুকাল হইতেই লক্ষিত হইয়া আসিতেছে এবং প্রথম রূপটিকে পূর্ব্বমেঘ ও দ্বিতীয় রূপটিকে উত্তরমেঘ নাম দেওয়া হইয়াছে। উত্তরমেঘে অলকা ও যক্ষের গৃহ-বর্ণনায় কালিদাসের অসাধারণ কল্পনা-শক্তিতে বিস্ময়মুগ্ধ হইতে হয়; কল্পনা যেন এখানে বাস্তবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এইজন্যই যুগে যুগে উত্তরমেঘ এমন একান্ত ভাবে সকলের মনোহরণ করিয়াছে। কিন্তু বর্তমান কালে পূর্ব্বমেঘ আমাদের নিকট বিশেষ কারণে অধিকতর মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বমেঘে কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের একান্ত মিলনেই উহা আমাদের নিকট অধিকতর আদরণীয় হইয়াছে। পূর্ব্বমেঘে কালিদাস রামগিরি হইতে কনখল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের যে বাস্তবরূপ চিত্রিত করিয়াছেন, তার জন্যই আমরা মেঘদূতকে বিশেষ করিয়া আদর করি। কালিদাস সত্যই ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি; কারণ তিনি শুধু ভারতবর্ষের পত্র পুষ্প, নদী-গিরি, জীবজন্তু প্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতিকেই আপন হৃদয় দিয়া অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তা নয়; পরন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষের বাস্তব-রূপটিকেও তিনি আপন সাধনার দ্বারা একান্ত আপন করিয়া লইয়াছিলেন।

পূর্ব্বমেঘ, রঘুর দিগ্বিজয়, ইন্দুমতীর স্বয়ংবর প্রভৃতি বহু উপলক্ষে তিনি বারংবার তৎকালীন অখণ্ড ভারতবর্ষকে আপন কাব্যরূপের ভিতর দিয়া অমর করিয়া রাখিয়াছেন। কালিদাসের ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না; কিন্তু তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের যে জীবন্ত ছবি রাখিয়া গিয়াছেন তা থেকে তাঁর অসাধারণ ভারত-প্রীতি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। তাম্রপর্ণীর মুক্তা, কাশ্মীরের কুঙ্কুম এবং বঙ্গের উৎখাত-প্রতিরোপিত ধান্য, এসব কিছুই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। এইজন্যই পূর্ব্বমেঘ আমাদের নিকট এত আদরণীয়। বিদিশা, দশার্ণ, অবন্তি, দশপুর প্রভৃতি স্থান আমাদের নিকট হয়তো পুরাতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানযোগ্য নাম মাত্রই থাকিয়া যাইত; কিন্তু পূর্ব্বমেঘের কাব্যরূপের ভিতর দিয়া এইসব স্থানের যে মনোহর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে তা মেঘদূতের সঙ্গেই চিরকাল অক্ষয় হইয়া থাকিবে। কালিদাসের ব্যক্তি-জীবন আমাদের অজ্ঞাত বটে, কিন্তু তিনি তাঁর যুগের ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপটিকে আমাদের অজ্ঞাত রাখেন নাই। ইহা কালিদাসের একটি বিশেষ দান এবং পূর্ব্বমেঘের একটি বিশেষ গৌরব। পূর্ব্বমেঘে যার সূচনা, রঘুর দ্বিগ্বিজয়, ইন্দুমতীর স্বয়ংবর প্রভৃতিতে তার পরিণতি। কালিদাস যদি শুধু ঋতুসংহার, উত্তরমেঘ ও কুমারসম্ভব লিখিয়া যাইতেন তবে তিনি আমাদের নিকট অর্দ্ধেক অপরিজ্ঞাতই থাকিতেন, তাঁর বাকি অর্দ্ধেকের পরিচয়

পাইতেছি পূর্ব্বমেঘ ও রঘুবংশ হইতে।

মেঘদূতের ছন্দ।—মেঘদূতের ধ্বনি রূপের আলোচনা করিতে গেলেই মন্দাক্রান্তা ছন্দের কথা বলিতে হয়। মেঘদূতের বিষয়-বর্ণনার সহিত মন্দাক্রান্তা ছন্দের গাম্ভীর্য্য ও ধ্বনি-বৈচিত্র্য এমন ভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে যে, মেঘদূত হইতে মন্দাক্রান্তা ছন্দকে আর বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই; বিচ্ছিন্ন করিতে গেলে আমাদের রস-বোধ নিরতিশয় ভাবে পীড়িত হয়। কাব্য মাত্রেরই ধ্বনি-রূপের একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কবির অন্তরে যে অনির্ব্বচনীয় রসধারা উৎসারিত হইতে থাকে তাকে শুধু ভাষার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধরাইয়া দেওয়া অসম্ভব; একদিক্ হইতে দেখিতে গেলে ভাষা জড় বস্তু, ভাব-প্রকাশের স্থাবর আধার মাত্র; কাব্যের অনির্ব্বচনীয়তাকে, ভাবের ভঙ্গিমা ও গতিবেগকে প্রতিরূপ দিবার ক্ষমতা শুধু ভাষার নাই; কিন্তু সঙ্গীতের সুর ও তালের মধ্যে, ছন্দের ধ্বনি ও যতির মধ্যে সে ক্ষমতা আছে। তাই গদ্য-ভাষা কাব্যের বাহন হয় নাই; কাব্যের বাহন হইবার জন্য ভাষাকে সঙ্গীত বা ছন্দের মধ্যে ধরা দিতে হয় এবং সে-জন্যই বিশেষ ভাবকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার জন্য কবিকে বিশেষ ছন্দের আশ্রয় লইতে হয়।

মন্দাক্রান্তা ছন্দ তেমনি মেঘদূতের বিশেষ বাহন। মেঘদূতের যে ভাব রূপ ও বিষয়রূপ,

তাকে প্রকাশ করার পক্ষে মন্দাক্রান্তার চেয়েও যোগ্যতর ছন্দ থাকিতে পারে একথা আজ আমরা ভাবিতেও পারি না। মেঘদূত যদি শুধু লিরিক্ বা গীতি-কবিতা হইত তবে মন্দাক্রান্তার চেয়ে লঘুতর অন্য কোনো ছন্দ অধিকতর উপযোগী হইত। মেঘদূত যদি লিরিক্-ভাব-হীন মহা-কাব্য মাত্র হইত তবে হয়তো শার্দূল-বিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা প্রভৃতি গম্ভীরতর ছন্দ-প্রয়োগের অবকাশ থাকিত। কিন্তু মেঘদূতে গীতি-কাব্য ও মহা-কাব্য উভয়ের অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়াছে, তাই মন্দাক্রান্তাই তার ধ্বনি-ব্যঞ্জনার উপযুক্ত আশ্রয় হইয়াছে। কারণ, মান্দাক্রান্তা ছন্দে ধ্বনির গুরু-গাম্ভীর্য্য আছে, গতির দৃঢ় মন্থরতাও আছে, অথচ বেগবত্তাও আছে; তার গতিক্রমে এবং স্বরের উত্থান পতন-ভঙ্গিমায়ও একটি বিশেষ বৈচিত্র্য আছে;—তাই মন্দাক্রান্তা ছন্দ একঘেয়ে হইয়া উঠে নাই। একটি উদাহরণ দিয়া দেখাইলেই বিষয়টা আরও বিশদ হইবে, আশা করি।—

মেঘালোকে | ভবতি সুখিনো' | প্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ।
কণ্ঠাশ্লেষ- | প্রণয়িনি জনে | কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি দুইটি একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই মান্দাক্রান্তা ছন্দ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যগুলির সার্থকতা বোঝা যাইবে। প্রথম চারটি অক্ষরই গুরুমাত্রিক, এখানে মন্দাক্রান্তা

অনুবাদ বলিয়া যে কয়খানি বই প্রচলিত আছে তার একখানিকেও আদর্শ অনুবাদ বলা চলে কি না সন্দেহ।

মেঘদূতের অনুবাদ কিরূপ হওয়া উচিত সে-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আর একটু খুলিয়া বলা দরকার। কাব্যের ধ্বনিরূপকেই ভাষান্তরে ফুটাইয়া তোলা সব-চেয়ে মুস্কিল এবং অধিকাংশ অনুবাদকই এ বিষয়টিকে এড়াইয়া চলেন। মেঘদূতের ধ্বনির অনুবাদ করিতে হইলে প্রথমেই মন্দাক্রান্তার অনুরূপ একটি বাঙ্‌লা ছন্দ বাছিয়া লওয়া দরকার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যৌগিক অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের ধ্বনিরূপকে ফুটাইয়া তোলা সম্ভব নয়; যদি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মেঘদূতের অনুবাদ করিতেই হয় তবে পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি মামুলি ছন্দ ছাড়িয়া আট, চার ও ছয় অক্ষরের তিন পর্ব্বে আঠারো অক্ষরের ছন্দে অনুবাদ করাই উচিত মনে করি। আর চল্‌তি কথার বাঙ্‌লা নৃত্য-চপল স্বরবৃত্ত ছন্দে মেঘদূতের অনুবাদ করিতে প্রয়াসী হইলে মন্দাক্রান্তার গুরু-গম্ভীর ধ্বনিটিকেই একেবারে পিষিয়া মারা হয়। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, ধ্বনি-গাম্ভীর্য্য এবং গতি-মন্থরতাই মন্দাক্রান্তার মর্ম্ম-স্বরূপ। অথচ সাধারণ বাঙ্‌লা স্বরবৃত্ত ছন্দে ধ্বনি-গাম্ভীর্য্য ও গতি-মন্থরতা তো নাই-ই; বরং ধ্বনির লঘুতা এবং গতির নৃত্যপর চপলতাই ওই ছন্দের বিশেষত্ব। সুতরাং স্বরবৃত্ত ছন্দে

মন্দাক্রান্তাকে রূপান্তরিত করিলে মেঘদূতকে আর মেঘদূত বলিয়া চিনিবারই উপায় থাকে না ; তার ধ্বনিরূপের এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ভাবরূপের বিকৃতি ঘটাও অপরিহার্য হইয়া উঠে। যাঁরা মেঘদূতের স্বরবৃত্ত রূপ দেখিয়াছেন তাঁরাই একথা স্বীকার করিবেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ যে স্বর-মাত্রিক মন্দাক্রান্তার প্রবর্তন করিয়াছেন তা বাঙ্‌লা কাব্যে বহুল ব্যবহার করা কত শক্ত সে-কথা না বলিলেও চলে। ঐ ছন্দে স্বতন্ত্র কবিতা রচনা করা বরং চলিতে পারে ; কিন্তু ঐ ছন্দে মেঘদূতের অনুবাদ করা একেবারেই অসম্ভব মনে হয়।

কাজেই দেখিতে পাইতেছি, বাঙ্‌লা অক্ষরবৃত্ত কিংবা স্বরবৃত্তকে মন্দাক্রান্তার বাহন করিলে ছন্দ-সঙ্গতি রক্ষা হয় না ; অতএব মন্দাক্রান্তার ধ্বনিগত স্বরূপটি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া মেঘদূতের অনুবাদ করিতে হইলে বাঙ্‌লা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় নাই। অথচ আজ পর্যন্ত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মেঘদূতের কোনো অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। কিন্তু বাঙ্‌লা মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরও শ্রেণীভেদে বহু বিভিন্ন রূপ আছে। তার মধ্যে কোন্ বিশেষ ছন্দটি মন্দাক্রান্তার সব-চেয়ে বেশী অনুরূপ, তা বাছিয়া ঠিক করিতে হইলে বিশেষ ছন্দ-নিপুণতা থাকা চাই। কিন্তু এই বাছাই কার্যে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে একথা মনে রাখিতে

হইবে যে, সুর-প্রাধান্য এবং ধ্বনির তরলতা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের স্বাভাবিক বিশেষত্ব, এইজন্যই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ লিরিক্ বা গীতি-কবিতার পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দে গতির বৈচিত্র্য সচরাচর দেখা যায় না। তাই মন্দাক্রান্তার মতো ধ্বনি-বৈচিত্র্যময় ছন্দকে মাত্রাবৃত্তে রূপান্তরিত করিতে হইলে খুব সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ; এমন একটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে বাছিয়া লইতে হইবে যাতে ধ্বনির গতিক্রম একঘেয়ে হইয়া না উঠে এবং এই ছন্দে লঘু ও গুরু মাত্রার সংস্থান এভাবে করিতে হইবে যেন মাত্রাবৃত্তের ধ্বনি স্বাভাবিক গীতি-কাব্য সুলভ তরলতা ও সুর-প্রাধান্য পরিহার করিয়া ভাবগম্ভীর কাব্যের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। এস্থলে সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দের ধ্বনি-স্বরূপের একটু বিশ্লেষণ করিলেই তার উপযোগী বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বাছিয়া লওয়া কঠিন হইবে না।

মন্দাক্রান্তা সতেরো অক্ষরের ছন্দ এবং সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্র-মতে যথাক্রমে চার, ছয় এবং সাত অক্ষরের তিনটি পর্বে প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি বা চরণ বিভক্ত, প্রত্যেক পর্বের পরই যতি। কিন্তু বাঙালীর কানে সাত অক্ষরের তৃতীয় পর্বটি অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয় এবং সুযোগ পাইলেই তৃতীয় পর্বের চতুর্থ অক্ষরের পরেই আর-একটি যতির জন্য বাঙ্গালীর কান ব্যগ্র হইয়া উঠে।

মেঘালোকে । ভবতি সুখিনো’ । প্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ

এখানে তৃতীয় পদের চতুর্থ অক্ষরের পরে যতি স্থাপনের কোনো স্বাভাবিক আশ্রয় নাই। কিন্তু—

কশ্চিৎ কান্তা । বিরহ গুরুণা । স্বাধিকার- । প্রমত্তঃ

এখানে সে আশ্রয় পাওয়ায় বাঙালীর কান মন্দাক্রান্তা ছন্দে তিনটির স্থানে চারটি যতি দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। কবি সত্যেন্দ্রনাথ যে বাঙ্‌লা মন্দাক্রান্তা ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন তাতে তিনিও তৃতীয় পদের চতুর্থ অক্ষরের পরে বাঙালী কানের অপরিহার্য এই নূতন যতিটিকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাঙ্‌লা ছন্দে, মন্দাক্রান্তার ধ্বনিকে ধরিতে গেলে প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তিকে চারটি পদে বিভক্ত করিতেই হইবে। যেহেতু বাঙ্‌লা ছন্দে লঘু গুরু মাত্রা স্থাপনের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নাই, সেজন্য মান্দাক্রান্তা ছন্দের প্রতি পদের মোট মাত্রাপরিমাণকেই বজায় রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটির প্রথম পদে চারটি গুরুস্বরান্ত অক্ষর,—মোট আট মাত্রা; দ্বিতীয় পদে পাঁচটি অক্ষর লঘু-স্বরান্ত ও একটি গুরুস্বরান্ত, সুতরাং মোট সাত মাত্রা, তৃতীয় পদেও তিনটি গুরু স্বরে ও একটি লঘু স্বরে মোট সাত মাত্রাই হইতেছে ; আর চতুর্থ পদে দুইটি গুরু ও একটি লঘু স্বরে মোট পাঁচ মাত্রা।

অতএব মন্দাক্রান্তা ছন্দকে বাঙ্‌লা মাত্রাবৃত্তে রূপান্তরিত করিতে গেলে তার প্রত্যেক

পঙ্‌ক্তির চারটি পর্বে যথাক্রমে আট, সাত, সাত এবং পাঁচটি করিয়া মাত্রা থাকা দরকার; তা হইলেই অন্তত পর্বচ্ছেদ বিষয়ে মন্দাক্রান্তার অনুরূপ ছন্দ হইবে। কিন্তু মাত্রাবৃত্তে এক পর্বে আট মাত্রা ও তার পরেই দুইটি সাত-সাত মাত্রার পর্ব রচনা করার বিপদ আছে, কারণ তাতে ছন্দের মধ্যে অশোভন রকম ধ্বনি বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং প্রথম পর্বটি হইতে একটি মাত্রা কমাইয়া দিয়া প্রথম তিনটি পর্বকেই সপ্তমাত্রিক করাই সবচেয়ে নিরাপদ; তাতে সংস্কৃতের চেয়ে বাংলায় মাত্র এক মাত্রার পার্থক্য হইবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনটি সপ্তমাত্রিক ও একটি পঞ্চমাত্রিক পর্বের সাহায্যে বাঙ্‌লা ছন্দ যথাসম্ভব সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার সারূপ্য লাভ করিবে। প্যারীবাবু মেঘদূতের অনুবাদকালে এই ত্রিসপ্ত-পঞ্চমাত্রিক ছন্দের আশ্রয় লইয়া ছন্দ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন বলিয়াই মনে করি। কারণ, তাতে মন্দাক্রান্তার গতি-ভঙ্গী অনেকটাই রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এই সপ্তমাত্রিক ছন্দ ব্যবহারে একটা বিপদের কথাও এখানে বলা প্রয়োজন। বাঙ্‌লায় একটানা অবিচ্ছেদ্য সাতমাত্রার ছন্দ রচনা করা যায় না। সাত মাত্রার ছন্দের প্রত্যেক পর্বের মধ্যেই একটুখানি ছেদ এবং একটি করিয়া ঈষদ্‌ যতি থাকিবেই, কারণ সপ্তমাত্রিক পর্ব আসলে সচরাচর তিন ও চার মাত্রার এবং কখনও কখনও চার ও তিন মাত্রার সংযোগে উৎপন্ন। প্যারী-বাবুর ব্যবহৃত সপ্তমাত্রিক ছন্দ

আসলে ত্রি-চতুর্মাত্রিক ; প্রতিপঙ্‌ক্তি-পর্ব্বেই তাঁকে তিন-চারের সমাবেশ করিতে হইয়াছে, অন্য কোনো রকম সমাবেশ সম্ভব নয়। এইজন্যই মূল মন্দাক্রান্তার তুলনায় অনুবাদ কতকটা একঘেয়ে শুনিতে হইয়াছে। নিপুণ শ্রুতি-ধরের নিকট এই ত্রুটিটুকু অলক্ষিত থাকিবে না। কিন্তু সপ্তমাত্রিক ছন্দে এই অসুবিধাটুকু পরিহার করার উপায় নাই। তাই মনে হয়, প্যারী-বাবু যদি সপ্তমাত্রিক ছন্দ ব্যবহার না করিয়া ষণ্মাত্রিক ছন্দ ব্যবহার করিতেন, তবে সমস্ত পঙ্‌ক্তিতে মোট চার মাত্রার অভাব হেতু প্রতি-পঙ্‌ক্তি-পর্ব্ব ধ্বনি-দৈর্ঘ্যে কিছু খাটো হইলেও তিনি হয়ত। এই ত্রুটিটুকুকে বাঁচাইয়া চলিতে পারিতেন, কারণ ষণ্মাত্রিক ছন্দে মাত্রা-সমাবেশের প্রচুর সুযোগ আছে। যাহোক্, মাত্রাবৃত্তে মন্দাক্রান্তার ধ্বনি-বৈচিত্র্য রক্ষা করিতে হইলে গুরু-লঘু স্বরের সমাবেশ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন, প্যারী বাবু একথা বিস্মৃত হন নাই। মাত্রাবৃত্তের প্রথম ও তৃতীয় পর্ব্ব দুইটিকে গুরুস্বরবহুল, দ্বিতীয় পর্ব্বটিকে লঘুস্বরবহুল করা এবং চতুর্থ পর্ব্বের শেষ দুইটি স্বরকে গুরু করা বিশেষ প্রয়োজন। প্যারী-বাবু প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির শেষ স্বরটিকে প্রায় সর্ব্বত্রই গুরু করিয়াছেন, তাই প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তি পড়িয়া শেষ করার পরেই যেন মন্দাক্রান্তার ধ্বনির রেশ কানে বাজিতে থাকে। দ্বিতীয় পর্ব্বের লঘুস্বরবাহুল্যও প্রায় সর্ব্বত্রই আছে, যদিও ঈষদ্ গতিটির বাধা হেতু ধ্বনিবেগ

যথেষ্ট প্রখর হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় পর্বে গুরুস্বর-বাহুল্য বহু স্থলেই রক্ষিত হয় নাই। অনুবাদে ছন্দের সমস্ত দাবী রক্ষা করা কত কঠিন তা যিনি মন্দাক্রান্তাকে বাঙ্‌লা ছন্দে প্রতিধ্বনিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই জানেন।

তথাপি প্যারী-বাবু অনুবাদে মূলের ধ্বনি বজায় রাখার দুরূহতায় অভিভূত হইয়া হাল ছাড়িয়া দেন নাই, ইহাই সুখের বিষয়। তিনি যদি মেঘদূতের ধ্বনিকে বাঙ্‌লায় প্রতিধ্বনিত করার গুরুত্বে পরাহত হইয়া নিজের সুবিধামত এক-একটি শ্লোককে এক-এক ছন্দে অনুবাদ করিতেন তবে তা মার্জ্জনীয় হইত বলিয়া মনে করি না; তাতে অনুবাদ যেমন বিকলাঙ্গ হইত, অনুবাদকের ছন্দরক্ষার অক্ষমতাও তেমনি প্রকাশ পাইত। কারণ, কালিদাস যখন তার মেঘদূত আগাগোড়া একই ছন্দ রচনা করিয়াছেন, তখন একঘেয়েত্বের অপবাদ দিয়া তাকে নিজের সুবিধা-মত বিভিন্ন ছন্দে অনুবাদ করার অধিকার অনুবাদকের আছে কি না সন্দেহ। কালিদাসকেও সমস্ত মেঘদূতখানা একই মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচনা করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল, সমঝ্‌দার পাঠক মেঘদূতের বহু স্থানেই তার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন। কিন্তু তাই বলিয়া কালিদাস মেঘদূতের সর্ব্বত্র একই ছন্দ রক্ষার চেষ্টায় বিরত হন নাই। সুতরাং অনুবাদকে মূলাগত করিবার জন্য অনুবাদকের কষ্ট স্বীকার করিয়া লইলেও সমগ্র একই ছন্দ

ব্যবহার করা সঙ্গত। আর এই একই কারণে প্রত্যেকটি শ্লোকের অনুবাদকেও চারটি পঙ্‌ক্তির মধ্যেই সমাপ্ত করা প্রয়োজন। নতুবা অনুবাদের মূলানুগত্য রক্ষা করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু বাঙ্‌লায় মেঘদূতের যে কয়খানি পদ্যানুবাদ আছে তাতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্থলেই প্রত্যেকটি অনূদিত শ্লোক চার পঙ্‌ক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। অনেক স্থানেই অনুবাদ ব্যাখ্যার আকার ধারণ করিয়াছে এবং এই একটি নূতন বিপদ্ ঘটিয়াছে যে, অতিরিক্ত চরণগুলিকে পূর্ণ করিবার জন্য অনুবাদককে বহু স্থানেই কালিদাসের কথার সঙ্গে নিজেদেরও অনেক কথা জুড়িয়া দিতে হইয়াছে। তাতে অনুবাদ জিনিসটাই যে কতখানি বিকৃত হইয়া যায়, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। প্যারী-বাবু প্রত্যেকটি শ্লোকের অনুবাদকেও চারটি চরণেই সমাপ্ত করিয়াছেন। তাতে অনুবাদ ভাষ্য-ভাবাপন্ন হইয়া উঠে নাই এবং কালিদাসের ভাবটি অনেকখানি জায়গা না জুড়িয়া চার চরণের সংকীর্ণ-পরিধির মধ্যে সংহত হওয়ার মূলের মতনই গাঢ়তা পাইয়াছে, আর অনুবাদকও মূলের কথার সঙ্গে নিজের কথা যোগ করার অপ্রীতিকর দায় থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।

অনুবাদে আর-একটি কথা সবচেয়ে বেশী মনে রাখা দরকার—সেটি হইতেছে অনুবাদের শব্দ প্রয়োগকে যথাসম্ভব মূলের অনুগত করা। সংস্কৃত ভাষার বাঙ্‌লা অনুবাদের একটি সুবিধা

এই যে, অনেক মূল সংস্কৃত শব্দকেই বাঙ্‌লায় অবিকল ব্যবহার করা যায়; তাতে অনুবাদ পাঠকেরা মূলের অনেক কথাই জানিতে পারেন। এই সুবিধাটি গদ্যানুবাদেই বেশী; পদ্যানুবাদে অনুবাদক অনেক সময়েই ছন্দের খাতিরে মূলে নাই এমন অনেক কথাই ব্যবহার করিতে প্রলুব্ধ হন। কিন্তু প্যারী-বাবু অনেক স্থলেই এই লোভ সংবরণ করিয়া কালিদাসের মূল কথাকেই যথাসম্ভব বাঙলায় চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাতে মূলের মর্য্যাদাও রক্ষিত হইয়াছে এবং অনুবাদের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। মূল সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা অনুবাদ পাশাপাশি দেওয়াতে অনুবাদ মূলানুগত হইয়াছে কি না তা মিলাইয়া দেখিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে; সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকেরা অনেক সময়ই মূল সংস্কৃত পাঠের অভাব বোধ করিয়া থাকেন। মূলে আছে—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনো' প্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষ- প্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে॥

তার অনুবাদ এইরূপ—

হেরিয়া জলধর সুধীরো অন্তর থাকিতে চাহে না যে অচঞ্চল;
কণ্ঠলীন প্রিয়- জনেরে ছেড়ে দূরে রহে যে তার দশা কিবা তা বল্‌?

মূল পাঠ—তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাৎ দূরবন্ধুর্গতোঽহং

যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।

তাঁর অনুবাদ—বঁধুর পাশ হ'তে হয়েছি দূরগত দৈব-বশে, হও করুণাময় ;

বিমুখ করে যদি মহতে তবু মাগি, কামনা পূরালেও অধমে নয়।

বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্তোপহারঃ, এই কথাটার অনুবাদ হইয়াছে—"বন্ধু-প্রীতি-ভরে ভবন-শিখী দেবে নৃত্য-উপহার"। এই রকম চমৎকার মূলানুগ অনুবাদ অনেক স্থানেই পাওয়া যাইবে। কিন্তু সব জায়গায় যে এরূপ মূল-সঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে তা নয়, এবং এরূপ রক্ষা করাও সম্ভব কি না সন্দেহ।

যাহোক, মেঘদূতের কাব্যানুবাদের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলাম। প্যারীবাবু সে আদর্শ-রক্ষায় কতখানি সমর্থ হইয়াছেন, তার বিচারের ভার আমার উপর নয়। তাঁর সফলতা ও বিফলতার বিচারের ভার সাহিত্য-রসিক সমালোচকদের উপরেই রহিল। মেঘদূতের কাব্যানুবাদ-কার্য্যে অগ্রসর হইয়া প্যারীবাবু নিজের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনুবাদের আদর্শকে খাটো করেন নাই, শুধু ইহাই আমার বক্তব্য।

মেঘদূতের পাঠ।—ইংরাজি ১৮১৩ সালে বিখ্যাত মনীষী হোরেস হেম্যান্ উইল্‌সন

ইংরাজি অনুবাদ ও প্রচুর টীকা-টিপ্পনিসহ মেঘদূতের একটি ইংরাজি সংস্করণ প্রকাশ করেন ; জার্মান্ মহাকবি গ্যয়টে মেঘদূতের ইংরাজি অনুবাদ পড়িয়া মুগ্ধ হন। সেইদিন হইতে কালিদাসের মেঘদূত ও অন্যান্য কাব্য আলোচনার একটি নূতন পর্যায়ের সূত্রপাত হইয়াছে। তখন হইতেই আধুনিক পণ্ডিতেরা তীক্ষ্ণ সমালোচনার দৃষ্টি ও ঐতিহাসিক বোধ লইয়া কালিদাস ও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে এক নূতন রকম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফলে কালিদাসের কালনির্ণয় ও কালিদাসের যুগে ভারতের রূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মেঘদূত এবং কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের প্রকৃত পাঠ নির্ণয়ের জন্যও তাঁরা কম চেষ্টা করেন নাই। তাঁদের চেষ্টায় মেঘদূতের বহু টীকা অসংখ্য পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়াছে এবং এইসমস্ত পাণ্ডুলিপি ও টীকার পারস্পরিক তুলনার ফলে মেঘদূতের প্রচলিত পাঠের অনেক অসঙ্গতি ধরা পড়িয়াছে। পূর্ব্বোক্ত জৈন কাব্য পার্শ্বাভ্যুদয়ের ধৃত পাঠও মেঘদূতের প্রকৃত পাঠ নির্ণয়ের পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছে।

এই পুস্তকে বাঙ্‌লা দেশে প্রচলিত মেঘদূতের পাঠকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা হয় নাই ; আধুনিক বিচারের আলোকে পাঠ-সংস্কারের কতকটা চেষ্টা করা হইয়াছে। সে দায়িত্ব আমারই। এই কার্য্যে প্রধানত বল্লভদেব ও জিনসেনের ধৃত পাঠের উপরেই নির্ভর করিয়াছি। যে-যে

স্থানে আমাদের পাঠ বাঙ্‌লায় প্রচলিত মল্লিনাথের পাঠ হইতে পৃথক হইয়াছে তা প্রয়োজনমতো গ্রন্থের শেষে "মেঘদূত-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। বল্লভদেবের পাঠ যে-স্থলে মল্লিনাথের পাঠের চেয়ে অধিকতর সঙ্গত তাও সেখানে কিছু কিছু দেখানো হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক বল্লভদেব ও জিনসেনের পাঠ দেখিয়া লইবেন। প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া মল্লিনাথ-ধৃত বহু প্রচলিত সমস্ত শ্লোকগুলিই রাখা হইল; তবে মল্লিনাথ নিজে যেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন সেগুলির মধ্যে দুইটিকে (উত্তরমেঘ, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোক) এই গ্রন্থে স্থান দেওয়া হইয়াছে। মল্লিনাথ গৃহীত শ্লোকপারম্পর্য্যে কোনো পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। যে-সব জায়গায় বাঙ্‌লা দেশের অভ্যস্ত পাঠ গ্রহণ করিলে কাব্যের ভাবগত কোনো অসঙ্গতি ঘটে না সে-সব স্থানে সাধারণত পাঠপরিবর্ত্তন করা হয় নাই। যে-সব স্থানে ঐ অসঙ্গতি ঘটে প্রধানত সে-সব স্থানেই পাঠপরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে পাঠ-সংস্কার করিয়া বাঙ্‌লাদেশে মেঘদূতের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার বিশেষ প্রয়োজন এখনও রহিল।

"লাল্‌কুঠি"
তেলিনীপাড়া, জিলা হুগলি
২৭ মাঘ, ১৩৩৭

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

মেঘদূতের পাঠসংস্কার

(দ্বিতীয় সংস্করণে বক্তব্য)

আমাদের সম্পাদিত মেঘদূতের প্রথম সংস্করণ সর্বত্রই অনুকূল সমালোচনার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। যাঁরা এই গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে দুইজন খ্যাত-নামা সাহিত্যিকের নাম এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে ;—একজন শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চটোপাধ্যায়, আর একজন স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আর, এই গ্রন্থের প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন মাত্র একজন। তিনি শ্রীবীরেশ্বর সেন। তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকাতে "অভিনব মেঘদূত এবং কালিদাসের অবমানন" নাম দিয়া আমাদের সম্পাদিত মেঘদূতের একটি অতি উগ্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। কি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তিনি এরকম অসংযত ও উপহাসসূচক সমালোচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন জানি না। কিন্তু তাঁর অশিষ্ট ভাষা ও সৌজন্যলেশহীন ভঙ্গি দেখিয়া ওই সমালোচনার প্রতিবাদ করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। এখন আমাদের মেঘদূতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। তাই এসময় পাঠকদের অবগতির জন্য উক্ত আক্রমণের সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া সঙ্গত বোধ করিতেছি।

প্রথমেই বলা দরকার যে, আমাদের সম্পাদিত মেঘদূতের বাঙ্‌লা অনুবাদ, কালিদাস ও মেঘদূতের ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক আলোচনা, দুরূহ শব্দাদির ব্যাখ্যা, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা, দেশ-পরিচয়, কালিদাসের যুগে উত্তর ভারতের মানচিত্র ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বীরেশ্বরবাবুর একটি কথাও বলিবার নাই। তাঁর সমস্ত অভিযোগ মেঘদূতের সংস্কৃত অংশের পাঠ লইয়া। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছিলাম, "এই পুস্তকে বাঙ্‌লা দেশে প্রচলিত মেঘদূতের পাঠকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা হয় নাই; আধুনিক বিচারের আলোকে পাঠ-সংস্কারের কতকটা চেষ্টা করা হইয়াছে। এই কার্য্যে প্রধানত বল্লভদেব ও জিনসেনের ধৃত পাঠের উপরেই নির্ভর করিয়াছি।" বীরেশ্বরবাবু আমার এই কথা বিশ্বাস করতে পারেন নাই। তাঁহার "বোধ হয় যে প্রবোধ-বাবু কালিদাসকে নিতান্ত গর্দ্দভ ছাত্র ভাবিয়া তাঁহার রচনা কাটিয়া কুটিয়া দিয়াছেন" এবং তিনি মনে করেন যে, প্রবোধ-বাবু "একশত পনের" (সংখ্যাটি অত্যন্ত ভুল এবং ফাঁপানো) স্থলে কালিদাসের "পাঠ কাটিয়া নূতন পাঠ বানাইয়া দিয়াছেন"। তাঁহার "দৃঢ় বিশ্বাস" যে, ওই সব পাঠের "একটাও বল্লভদেবের অথবা জিনসেনের ধৃত পাঠ নহে, কেন-না পূর্ব্বকালীন আচার্য্যগণ মোটেই কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিলেন না" এবং "অতি-দায়িকতা বশতঃই প্রবোধ বাবু কালিদাসের

উপর কলম চালাইয়া এই সকল অপপাঠ সৃষ্টি করিয়াছেন।"

সংযত ও শোভন আলোচনায় সাহিত্য এবং লেখক উভয়েরই উপকার হয়। কিন্তু এইরূপ সমালোচনার জবাব দিতেও কুণ্ঠা বোধ হয়। প্রাচীন আচার্য্যগণ কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিলেন না একথা খুবই সত্য ; কিন্তু আধুনিক সমালোচকের কাণ্ডজ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কেননা, তিনি শুধু "দৃঢ় বিশ্বাসের" জোরেই প্রতিপক্ষকে 'নস্যাৎ' করিয়া উল্লাস বোধ করিতেছেন। যে জাগিয়া ঘুমায় তাকে জাগানো অসম্ভব। বীরেশ্বরবাবু বল্লভদেব বা জিনসেনের পাঠ না দেখিয়াই যে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন তা খণ্ডন করাও সম্ভব নয়। নতুবা তাঁকে বলিতাম যে মেঘদূতের একটি শব্দও আমি "বানাইয়া" দেই নাই ; ওরকম বানাইবার শক্তি থাকিলে নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। তিনি যতখানি কষ্ট স্বীকার করিয়া "অপপাঠ"গুলি আবিষ্কার করিয়াছেন তার সিকিভাগ কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি তিনি বল্লভদেব ও জিনসেনের পাঠের সঙ্গে আমাদের ধৃত পাঠ মিলাইয়া দেখিতেন তাহা হইলে বুঝিতেন যে, আমি নিজে "গোপনে" বা "প্রকাশ্যভাবে" একটি অক্ষরও পরিবর্ত্তন করি নাই, সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বাচার্য্যদের অনুসরণ করিয়াছি। শুধু তাই নয়, বাঙলো দেশে প্রচলিত মেঘদূতের আট-দশখানি বইয়ের পাঠ মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বীরেশ্বর-বাবু

যে পুস্তকখানিকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাও অকাটা এবং নির্ভুল নয়। তিনি আমাদের যে সমস্ত পাঠকে 'অপপাঠ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তার অনেকগুলিই বাঙ্‌লা দেশে সুপ্রচলিত মেঘদূতের পাঠ থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন। যিনি কোনো সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি পড়িয়া দেখা কর্ত্তব্য মনে করেন না তাঁর সমালোচনার আর অধিক প্রতিবাদ করাও নিষ্প্রয়োজন বোধ করিতেছি। তবে পরিশেষে একথা বলা প্রয়োজন যে, আমাদের ভুল দেখাইতে গিয়া বীরেশ্বর-বাবু যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাতে তিনি নিজেই অনেকগুলি বিষম ভুল করিয়াছেন। কিন্তু সেগুলির উল্লেখ করার স্থান এটা নয়।

এই উপলক্ষ্যে পাঠকদের অবগতির জন্য মেঘদূতের পাঠ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া রাখা সঙ্গত মনে করি। কালিদাস মেঘদূত লিখিয়াছিলেন সম্ভবত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে। আর জৈনকবি জিনসেনাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন অষ্টম শতকের শেষ ভাগে। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'হরিবংশ' ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। পরবর্ত্তী কালে তিনি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশীয় জৈন সম্রাট প্রথম অমোঘবর্ষদেবের (খৃঃ ৮১৫-৭৭) ধর্ম্মগুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন। অমোঘবর্ষের রাজত্বের প্রথমাংশেই তিনি "পার্শ্বাভ্যুদয়" নামক কাব্য রচনা করেন।

এই কাব্যখানিতে তিনি অতি সুকৌশলে সমগ্র মেঘদূত কাব্যখানিকে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই কাব্যখানি হইতেই আমরা মেঘদূতের সর্বপ্রাচীন (খৃষ্টীয় অষ্টম—নবম শতকের) পাঠের সন্ধান পাইতেছি। আর মেঘদূতের প্রাচীনতম টীকাকার হইলেন কাশ্মীরী পণ্ডিত বল্লভদেব। তাঁর আবির্ভাবকাল সম্ভবত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক। বল্লভদেবের টীকার যে কয়খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য আছে। সুবিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথের আবির্ভাবকাল চতুর্দশ শতক, তিনিও স্থলে স্থলে মেঘদূতের পাঠ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁর টীকার সমস্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যেও সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নাই। তা ছাড়া দক্ষিণাবর্ত প্রমুখ আরও অনেক টীকাকারের রচনার বহু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত পাণ্ডুলিপির পারস্পরিক তুলনা করিয়া মেঘদূতের পাঠভেদ নির্ণয় করিতে হইবে। সে কাজ খুব সহজসাধ্য নয়। বর্তমান গ্রন্থে মেঘদূতের সমস্ত পাঠভেদগুলির উল্লেখ করিয়া এই কাব্যের একটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা-সম্মত সংস্করণ প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় এবং স্বল্প পরিসরের মধ্যে তা সম্ভবও নয়। বাঙ্‌লা কাব্যানুবাদের সাহায্যে মেঘদূতের রসসম্ভার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয়-স্থাপনই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। তথাপি গৌণভাবে মেঘদূতের যথার্থ পাঠনির্ণয়ের পথ নির্দেশ হিসাবে

এই পুস্তকে পাঠ-সংস্কারের সামান্য একটু প্রয়াস করিয়াছি। সাধারণের পাঠোপযোগী এই প্রকার গ্রন্থে গবেষণামূলক পুস্তকের ন্যায় সমস্ত পাঠান্তর প্রদর্শন ও তাদের আপেক্ষিক মূল্য-বিচার সম্ভব নয়। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, আমাদের বিবেচনায় মোটামুটি ভাবে জিনসেনের পাঠই টীকাকারদের ধৃত পাঠের চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। নানা কারণে এই পুস্তকে জিনসেনের পাঠ বেশী অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাই। জিনসেনের মতে মেঘদূতের শ্লোক-সংখ্যা একশো কুড়ি। মল্লিনাথ একশো একুশটি শ্লোকের টীকা লিখিয়াছেন বটে; কিন্তু তিনি তার মধ্যে ছয়টি শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা উক্ত ছয়টি শ্লোকের মধ্যে চারটিকে পরিত্যাগ করিয়া দুইটিকে (উত্তরমেঘ, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোক) এই গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছি।

বস্তুত আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সমস্ত পাঠ-ভেদ ও টীকা-টিপ্পনী সহ মেঘদূতের একটি সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বাঙ্‌লা সংস্করণে প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সংস্করণে "কালিদাস ও মেঘদূত',-শীর্ষক ভূমিকায় কয়েকটি স্থানে আবশ্যকমত সামান্য সংযোগ-বিয়োগ করা গেল এবং 'মেঘদূত-প্রসঙ্গে' আলোচিত বিষয়সমূহ (বিশেষত 'দেশ-পরিচয়' অংশ) বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইল।

দৌলতপুর কলেজ, খুলনা
বৈশাখ, ১৩৪৬

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

জন্ম—১৭ ফাল্গুন, ১৩০০ বঙ্গাব্দ (১৮৯৩)।

মৃত্যু—৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ (১৯৪৭)।

কবি, সাংবাদিক ও অধ্যাপকরূপে প্যারীমোহন সেনগুপ্ত তাঁর জীবদ্দশায় যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন প্রবীণেরা আজও তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। কালের অমোঘ নিয়মে এ-যুগের সাহিত্য-পাঠকের সঙ্গে তাঁর কবিকৃতির পরিচয় ক্ষীণ হয়ে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্র সমসাময়িক ও রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ইতিহাসে তাঁর রচনা অবান্তর বলে বিবেচিত হয়নি। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'অরুণিমা' ও 'কোজাগরী' সে যুগের কাব্যরসিক পাঠকের সম্বর্ধনা লাভ করেছিল। ঋক্‌বেদের কাব্যানুবাদে 'বেদবাণী' (সহ গ্রন্থকার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ও মন্দাক্রান্তা ছন্দে অনূদিত 'মেঘদূত' সুধী সমাজের কাছে বিপুল সমাদর লাভ করেছিল। বস্তুত তাঁর মেঘদূত সেই সময় পর্যন্ত কৃত অনুবাদগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসাবে সমালোচিত হয়েছিল। মন্দাক্রান্তা ছন্দ সম্বন্ধে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি কবিগুরুর 'ছন্দ' গ্রন্থে এবং রচনাবলীতে সঙ্কলিত হয়েছে।

হুগলী জেলার হরিপাল সন্নিহিত গোপীনাথপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা জলেশ্বর

সেনগুপ্ত। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। মাত্র আট বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে তাঁর জীবন-সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। সাহিত্যের প্রতি আবাল্য অনুরাগ তাঁর প্রথাগত বিদ্যালাভের পথে অন্তরায় হয়েছিল। রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের অন্তর্গত যে গীতিকবিদের সমাজে তিনি একজন ছিলেন সেখানে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ। কলকাতায় কলেজ জীবনে প্রথাগত বিদ্যালাভের চেয়ে তাঁর বড় প্রাপ্তি হয়েছিল রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের মধ্যমণি, ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সান্নিধ্য। চারুবাক্ ও মরমী কবি সত্যেন্দ্রনাথ অনুজ কবিদের পথপ্রদর্শনে ছিলেন স্নেহশীল অগ্রজ। এঁর সাহায্যেই প্যারীমোহন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন এবং স্বনামধন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদ লাভ করেন। অকালপ্রয়াত অগ্রজ কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহের ঋণ প্যারীমোহন সারা জীবন স্বীকার করেছেন।

ডিগ্রী লাভের আগেই সাংসারিক অনটনের চাপে তাঁর কলেজ জীবনের অবসান ঘটে। তিনি সরকারী অফিসে কেরানির কর্ম নিতে বাধ্য হন। কিন্তু যে ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উজ্জ্বল কৃতিত্বের সঙ্গে ইংরেজিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন এবং আকৈশোর

কাব্যপাগল যে তরুণ মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন, তাঁর পক্ষে সরকারী অফিসের কেরানিগিরিকে স্থায়ী জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগের ঘটনায় যখন সারা দেশ উত্তাল তখন তিনি ইংরেজ সরকারের চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং আগেই বলেছি, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সাহায্যে তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। কবিগুরু প্রদত্ত একটি সার্টিফিকেটের সাহায্যেই ১৯২৮ সালে তিনি কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন।

সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে তাঁর খ্যাতি প্রবাদের মত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আজও সেকথা তাঁর জীবিত ছাত্রদের মুখে মুখে ফেরে। খ্যাতি বা সাফল্যের নিরিখে তাঁর কবিসত্তা ও শিক্ষকসত্তার মধ্যে কোনটি মহত্তর তা বলা কঠিন। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার (৩. ৮. ১৯৭৬) সম্পাদকীয় নিবন্ধ "কাহার স্বার্থে"-র অংশাবশেষ এখানে উদ্ধারযোগ্য"··· শিক্ষার মানের প্রসঙ্গও প্রাসঙ্গিক। সব সময়েই কিন্তু সে-মান পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করে না। অতীতে যেসব বিদ্যালয় সুনাম অর্জন করিয়াছিল তাহাদের শিক্ষকদের ডিগ্রি ডিপ্লোমা হয়তো তেমন ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা দিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

তাঁহাদের কাছে ছাত্রছাত্রীরা সত্যই কিছু শিখিত। যদিও শিক্ষাগত সাফল্যের প্রতীক বিশেষ কিছু তাঁহাদের ছিল না। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার কিংবা প্যারীমোহন সেনগুপ্ত অথবা পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর অত্যন্ত উঁচুদরের শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু স্নাতক পর্যায়ের উপরে তাঁহারা কেউই ওঠেন নাই।"

মৃত্যুর আগে প্যারীমোহনকে একাধিক স্বজনবিয়োগের আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর এগারো মাস পূর্বে তাঁর প্রথমা কন্যা মারা গিয়েছিলেন এবং মাত্র তেইশ দিন আগে ক্যানসার রোগে তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটেছিল। ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ (২০. ৫. ১৯৪৭) তারিখে পথদুর্ঘটনায় উচ্চ রক্তচাপের রোগী প্যারীমোহন ইহলোক ত্যাগ করেন।

সাময়িকপত্র সেবার ক্ষেত্রে 'প্রবাসী' ও মডার্ন রিভিউ' ছাড়াও সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে তিনি সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং 'উদয়ন' পত্রিকার তিনি প্রথম সম্পাদক। তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলি হচ্ছে: ১. অরুণিমা (কবিতা সঙ্কলন, ১৯২৯), ২. বেদবাণী (ঋক্‌বেদের কাব্যানুবাদ—সহ-গ্রন্থকার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩০), ৩. মেঘদূত (অনুবাদ কাব্য, ১৩৩৭), ৪. কোজাগরী (কবিতাসঙ্কলন, ১৩৪০)।

এছাড়া শিশু ও কিশোর সাহিত্যের অন্তত কুড়িটি গ্রন্থ (হালুম বুড়ো, লক্ষ্মী ছেলে, মজার পদ্য, কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়, বাঘ-সিংহের মুখে, ভূতের লড়াই, বাংলাদেশের কবি, মহাত্মা গান্ধীর কারাকাহিনী, ভূতে-রাক্ষসে, শালিকের গঙ্গাযাত্রা, শেয়াল কবিরাজ, জয়হিন্দে অ আ ক খ, কেবল মজা প্রভৃতি) তিনি লিখেছিলেন। তাঁর সময়ে এমন কোন সাময়িকপত্র ছিল না যাতে তাঁর রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ১১৯ সংখ্যক পুস্তিকায় (ত্রয়োদশ খণ্ড) তাঁর জীবনী প্রকাশ করেছেন (১৯৮২)।

মেঘদূত প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেন মেঘের গমন পথের যে মানচিত্রের উল্লেখ করেছেন। অনিবার্য কারণে তা বর্তমান মুদ্রণে দেওয়া গেল না। এজন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী।

প্যারীমোহনের সহকর্মী, সে-যুগের ইংরেজি সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পুত্র ও এ-যুগের অন্যতম প্রধান কবি শ্রদ্ধাস্পদ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'শুদ্ধ কবি প্যারীমোহন'-এর স্মৃতিচারণ করে আমাদের প্রয়াসকে উৎসাহিত করেছেন সেজন্য এঁর কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী।

এই পুনর্মুদ্রণ ও পরিবেশনায় সাহায্য করেছেন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণা চট্টোপাধ্যায় ও নেপালচন্দ্র ঘোষ। এঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কলকাতা
১ আষাঢ়, ১৪০৩

অরুণাভ সেনগুপ্ত

"মেঘদূত" সম্বন্ধে অভিমত

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—"মেঘদূতের যতগুলি অনুবাদ আমি দেখিয়াছি, সবগুলির মধ্যে প্যারীবাবুর অনুবাদ আমার নিকট শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইয়াছে।...প্রবোধ-বাবুর প্রবন্ধগুলি এই সংস্করণের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।" (পঞ্চপুষ্প, বৈশাখ ১৩৩৮)

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—"আমার বোধ হয় সবার সেরা মূলানুগ অনুবাদ করেছেন প্যারীমোহন।...এই সংস্করণটি উপাদেয় হয়েছে। এতে কালিদাসের কাল কাব্য ছন্দ ও বাংলা অনুবাদের কাব্যরূপ ছন্দ প্রভৃতি অতি বিচক্ষণতার সহিত আলোচিত হয়েছে......।" (প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮)

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী—"আপনার মেঘদূতের পদ্যানুবাদ সুন্দর হইয়াছে। আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি ইহা পড়িয়া আমার খুব ভাল লাগিয়াছে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ বৈশাখ ১৩৩৮—"প্যারীবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি,—কালিদাসের মন্দাক্রান্তা ছন্দকে বাঙ্গলা ভাষায় যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া তাঁহার অনুবাদ-নৈপুণ্য

কেবল প্রশংসনীয় নহে, যাঁহারা এই শ্রেণীর অনুবাদ করিতেছেন, তাঁহাদের সম্মুখে আদর্শস্থানীয় বটে।"

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার—"বইখানি আমি দেখিয়াছি—সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে আপনার যশোবৃদ্ধি হইবে, সেজন্য অভিনন্দন জানাইতেছি।"

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত—"আপনার অনুবাদ দেখলাম। মন্দাক্রান্তার এতখানি বেশ বাংলায় অন্য কোথাও পেয়েছি ব'লে ত' মনে হয় না।"

নবমেঘ

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু ॥ ১ ॥

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥ ২ ॥

যক্ষ নিজ কাজে   করিলা অবহেলা,   কুবের তারে দিলা   কঠোর শাপ—
"নির্ব্বাসনে রহো   ত্যজিয়া প্রেয়সীরে,   দ্বাদশ মাস সহো   বিরহ-তাপ।"
দুঃখে রামগিরি-   আশ্রমে সে রহে   হারায়ে সহজাত   মহিমা তার,—
স্নিগ্ধ ছায়া যেথা   বিতরে তরু যত,   সীতার স্নানে পূত   সলিল যার। ১।

মাসের পর মাস   শৈলে করে বাস,   প্রিয়ার বিরহে সে   কান্তিহীন;
খসিয়া ভূমি 'পরে   সোনার বালা পড়ে,   নিটোল বাহু হ'ল   এমনি ক্ষীণ।
আষাঢ় মাস এল,   প্রথম দিনে তার   যক্ষ হেরে সেথা   গিরির গা'য়
লেগেছে মেঘ এক   ঘেরিয়া সানু দেশে,   দন্তাঘাতে রত   গজের প্রায়। ২।

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কেতকাধানহেতো
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥ ৩ ॥

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥ ৪
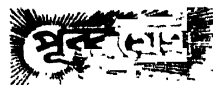
যে-মেঘ দরশনে ফুটিয়া উঠি' সদা কেতক ফুলকুল সুখে দোদুল,
যক্ষ তারি আগে নীরবে ভাবে কত, হৃদয় হ'য়ে ওঠে বাষ্পাকুল।
হেরিয়া জলধর সুখীরো অন্তর রহিতে চাহে না যে অচঞ্চল;
কণ্ঠলীন প্রিয় জনেরে ছেড়ে দূরে রহে যে তার দশা কিবা তা বল? ৩

বরষা সমাগত হেরিয়া বিরহী প্রিয়ারে বাঁচাবারে সে উন্মুখ,
ত্বরিত মেঘমুখে কুশল আপনার প্রেরিয়া প্রেয়সীর ঘুচাতে দুখ,
তুলিয়া গিরিজাত নবীন মল্লিকা নীরদে নিবেদিয়া অর্ঘ্য-ভার,
যক্ষ মেঘবরে মধুর প্রীতিভরে "স্বাগত" সম্ভাষ জানায় তার। ৪

ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥ ৫ ॥

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাৎ দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা ॥ ৬ ।

সলিল বায়ু জ্যোতি ধূম্রে জাত যেই এ যে সে জলধর চেতনহীন,
বারতা প্রেরিবারে চাহি যে পটু প্রাণী এ সব ভাবে না সে বেদনলীন
যক্ষ জড় মেঘে ভিক্ষা আপনার জানায় নতিভরে আবেগবান ;—
বিরহী জন কভু চেতন-অচেতনে বুঝে না ভেদাভেদ, হারায় জ্ঞান । ৫ ।

যক্ষ বলে—মেঘ, স্বেচ্ছারূপী তুমি, সচিব বাসবের, শোভিলে, ভাই,
বিদিত সেই কুল যে-কুলে পুষ্কর আবর্ত্তক সবে লভিল ঠাঁই ।
বঁধুর পাশ হ'তে হয়েছি দূরগত দৈব-বশে, হও করুণাময় ;—
বিমুখ করে যদি মহতে তবু মাগি, কামনা পূরালেও অধমে নয় । ৬ ।

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য ।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা ॥ ৭ ॥

ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসন্ত্যঃ
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥ ৮ ॥

শরণ তুমি, সখা, তাপিত মানবের, আমি যে বড় তাপী, সদয় হও,
কুবের-কোপানলে হয়েছি প্রিয়াহারা, প্রিয়ার সুখদায়ী বার্ত্তা বও
যক্ষপুরী সেই সুদূর অলকায় ;— যাহার উপবনে মহেশ্বর
রহিয়া গৃহ যত ধৌত করি' দেন ঢালিয়া নিজ শির- চন্দ্রকর। ৭।

উঠিলে নভে তুমি পথিকবধূ কত ভাবিবে দেখা হ'বে প্রিয়ের সাথ ;
চূর্ণ কেশ তারা সরায়ে মুখ হ'তে করিবে তব প্রতি নয়নপাত।
আমার সম যেই অধম পরাধীন যাপিছে ঘোর দুখে দিবস, হায়,
সে ছাড়া কেবা আর ছাড়িয়া প্রিয়তমা থাকিতে বল চায় হেরি' তোমায় ? ৮

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তোয়গৃধ্নুঃ ।
গর্ভাধানস্থিরপরিচয়া নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥ ৯ ॥

তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াং
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতিপ্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥ ১০ ॥

পবন অনুকূল তোমারে ধীরে ধীরে বাহিয়া লয়ে যাবে, হে মেঘবর,
তোমার বাম পাশে চাতক জললোভী করিবে কত রব হর্ষকর।
তোমারে হেরি' নভে মিলন-কাল জানি' বলাকা সারি বাঁধি' সমুৎসুক
ছুলিবে মালা সম তোমার বুক 'পরে, তুমি যে তাহাদের নয়নসুখ। ৯।

গমন-পথে, সখা, পাবে না কোনো বাধা, হেরিবে পতিপ্রাণা বিরহ-ক্ষীণ
ভ্রাতৃবধূ তব আশায় বাঁচি' রহে, বিরহ-শেষ-আশে গণিছে দিন।
রমণী-হিয়া যেন কোমল ফুল হেন, বিরহ-তাপে সদা ঝরিতে চায় ;
আশা যে বোঁটা সম ধরিয়া রাখে তারে ;—বিরহী হিয়া বাঁচে শুধু আশায়। ১০

কর্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জিতং মানসোৎকাঃ ।
আকৈলাসাদ্বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ
সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥ ১১ ॥

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু ।
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য
স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্ ॥ ১২
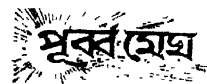
যে গুরু গরজনে জাগিলে ভূঁইচাঁপা, ধরণী ফুলে ফলে শোভিত হয়,
শ্রবণ-সুখকর সে-রব শুনি' ধেয়ে মানস-অভিমুখী মরালচয়
আসিবে তব পাশে পাথেয় করি' ঠোঁটে মৃণাল-কিশলয় কোমল-দল
চলিবে কৈলাস অবধি সাথে সাথে সহায় সম, শোভি' আকাশতল। ১১

যে গিরি কালে কালে তোমারে লভি' বুকে বিরহ-তাপময় বাষ্পভার
উগারি', স্নেহ তার প্রকাশে তব প্রতি, রয়েছে অঙ্কিত সানুতে যার
ভুবন-বন্দিত শ্রীরাম-পদ-রেখা,— তোমার প্রিয় সেই তুঙ্গকায়
শৈলে প্রীতিভরে বাঁধিয়া তব বুকে, মাগিয়া ল'য়ো, সখা, তব বিদায়। ১২

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ং ।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য ॥ ১৩

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভি
র্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙমুখঃ খং
দিঙনাগানাং পথি পরিহরন স্থূলহস্তাবলেপান ॥ ১৪

যে-পথে অলকায় যাইবে বলি তায় বিবরি' ধীরে ধীরে, দাও হে কান
বার্ত্তা প্রিয়া তরে বলিব শেষে, ভাই, কর্ণ দিয়ে তাহা করিও পান।
অলকা বহু দূর, চলিতে পেলে ক্লেশ গিরির শিরে শিরে বসিও থির ;
বরষি' ঘন ঘন তনুটি ক্ষীণ হ'লে করিও পান লঘু স্রোতের নীর। ১৩।

পবনে গিরিচূড়া উড়াল আজি কি রে,— সিদ্ধ-অবলারা তুলিয়া মুখ
মুগ্ধ সচকিত চাহনি দিয়ে তোমা' ভরাবে উৎসাহে তোমারি বুক।
গগনে উঠি' তুমি চলিও উত্তর ছাড়িয়া সেথাকার নব বেতস ;
বাড়ায়ে শুঁড় যবে আসিবে দিঙ্‌নাগ, এড়ায়ো তার স্থূল কর-পরশ। ১৪

রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তা-
দ্বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য ।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ॥ ১৫ ॥

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ ।
সদ্যঃ সীরোৎকর্ষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ প্রবলয় গতিং ভূয় এবোত্তরেণ ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রধনুকের খণ্ড জাগে যেন মাটির ঢিবি 'পরে ওই হোথায় !—
রতন কত যেন বিচ্ছুরি' চারু ছায়া মিলিয়া তারি 'পরে মোহন ভায়।
তোমার শ্যাম দেহ সে-ধনু পরশিলে তোমাতে উজলিবে শোভা বহুল ;—
শোভিবে যেন, আহা, বিষ্ণু গোপবেশী বেঁধেছে শিখী-পাখা শিরে অতুল। ১৫

তোমার কৃপা-ধারা শস্যে ঢালে প্রাণ, তাইত পল্লী- বধূ-নিচয়
তোমারে দিবে, ভাই, সরল প্রীতি-দিঠি বিলাসহীন অতি মাধুরীময়।
সদ্য-হালে-চষা আর্দ্র মালভূমি ছড়াবে সোঁদা সোঁদা সুরভি বাস ;
আরোহি' তাহে তুমি প্রবল করি' গতি চলিও উত্তর, হে তাপনাশ ! ১৬।

২

ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্দ্ধ্না

বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ ।

ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়

প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ ॥ ১৭ ॥

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ-

স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে ।

নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং

মধ্যে শ্যামস্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ ॥ ১৮ ॥

উচ্ছল জলধারে গিরির দাবানল নিবায়ে হবে যবে ক্লান্তকায়,
সাদরে শিরোপরে রাখিবে তোমা' ধ'রে আম্রকূট গিরি, বসিও তা'য়।
যে করে উপকার অধম জনও তারে বিমুখ নহে দিতে শরণ-ঠাঁই ;
মহৎ সেই গিরি তোমার দয়া স্মরি' শরণ দিবে তোমা', ভুল যে নাই। ১৭।

শৈল-ভরা বনে পাকিয়া আম যত সোনালি রঙে ভরে গিরি-শরীর,
চূড়ায় তার তুমি চিকণ-বেণী-কালো যখন, হে জলদ, রহিবে থির,
অমর-দম্পতি স্বরগ-দ্বার হ'তে পুলকে বিস্ময়ে হেরিবে তা'য়—
শিখরে কালো আর সোনালি দেহে গিরি শোভিছে ধরণীর স্তনের প্রায়। ১৮

স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্তং
তোয়োৎসর্গদ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥ ১৯ ॥

তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্ব্বাসিতং বান্তবৃষ্টি-
র্জম্বুখণ্ডপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ ।
অন্তঃসারং ঘন তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্ব্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥ ২০ ॥

কাননচর বধূ   বিহার করে যেথা   সেথায় ক্ষণতরে   দিও হে ছায় ;
বরষি' যত খুসী   কমায়ে জল-ভার   চলিও লঘু দেহে   ত্বরিত পা'য়।
বিন্ধ্যপদে ক্ষীণা   হেরিবে বহে রেবা,   উপলে ধারা তার   বহুধা হয়,—
যেন ও রে গজদেহে   নিপুণ তুলি ধরি'   কে আঁকে শাদা শাদা   লিখনচয় ১৯

জামের বনে যার   রুদ্ধগতি জল   বন্যগজমদ-   সুবাস ছায়,
রিক্ত-বারি তুমি   সে-রেবা-জল পিয়ে   হইও পুন', সখা,   পূর্ণকায়।
পবন পারিবে না   উড়াতে যেথা সেথা   সলিল-ভারে ভরা   তোমারে আর :—
পূর্ণ হিয়া যার   সে হয় গুরুভার,   তাহারা লঘু যারা   রিক্ত-সার। ২০।

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈ-
রাবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্ ।
দগ্ধারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গং ॥ ২১ ॥

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে ।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥ ২২ ॥

হেরিয়া আধফোটা সবুজ-পীত-আভ কেশর-যুত যত কদমফুল,
নদীর তীরে তীরে প্রথম-ফুটে-ওঠা কন্দলীর হেরি' নব মুকুল,
নিদাঘ-দাহ-শেষে সিকত কাননের সুবাস অবিরত করিয়া ঘ্রাণ,
ব্যাকুল মৃগদল ছুটিয়া বিঘোষিবে— এপথে তুমি জল করেছ দান। ২১।

আমার প্রীতি হেতু যদিও দ্রুত যেতে বাসনা তব, তবু লাগে যে ত্রাস,
গিরির পরে গিরি করাবে তব দেরী নিয়ত দিয়ে তোমা' ফুলের বাস।
ধবল-কোণ-যুত সজল আঁখি তুলি' যখন শিখীগুলি কেকা-মুখর
তোমারে বরি' লবে কেমনে তুমি তবে চলিবে আশুগতি, হে মেঘবর? ২২

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ-
নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ ।
ত্বয্যাসন্নে ফলপরিণতিশ্যামজম্বুবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ॥ ১৩

তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা ।
তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্মি ॥ ১৪ ॥

তোমার সমাগমে দশার্ণের মাঝে যতেক উপবনে বেড়ার গা'য়
ফুটিবে শাদা কেয়া টুটিয়া কাঁটা-জাল, ভবনবলিভুক্ পাখী সেথায়
গ্রামের চৈত্যেতে বাঁধিবে নিজ নীড়, জামের বনে কালো পাকিবে জাম ;
হংস সেথা যত করিবে উড়ি-উড়ি মানস-সরোবরে গমন-কাম। ২৩।

সেথায় পাবে তুমি বিদিশা রাজধানী, প্রথিত দেশে দেশে যাহার যশ ;
কামনা তব, মেঘ, পূরিবে সেথা সব, করিও পান মধু বিলাস-রস।
বেত্রবতী-জলে উর্ম্মিমালা তুলে' কূলেতে মৃদু মৃদু সুভাষ কয়,
ভ্রূকুটিময় যেন নদীর মুখ তাহা, তা' হ'তে ক'রো পান মিষ্ট পয়। ২৪।

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো-
স্ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।
যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্গারিভির্নাগরাণা-
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি ॥ ২৫

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চ-
ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি ।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাং ॥ ২৬

সে নদী পিছে রাখি' নীচৈ গিরি পাবে, হে সখা, বিশ্রাম ক'রো সেথায়,
পরশ পেয়ে তব পুলকে গিরি যেন উঠিবে শিহরিয়া কদম-গা'য়।
শিলার গৃহ হ'তে পণ্য রমণীর বিলাস-রাগ-বাস হ'তেছে বা'র,—
বুঝিবে, নাগরের সেথায় যৌবন হ'য়েছে উদ্দাম দুর্নিবার। ২৫।

জিরায়ে গিরি'পরে চলিও বন-নদী- তীরের উপবনে বরষি' জল,
সে নব জলকণা লভিয়া বিকশিবে যূথিকা কুসুমের মুকুল-দল।
কুসুম তুলি' তুলি' ক্লান্ত নারী মুছে কানের উৎপলে গণ্ডস্বেদ,
তাদের মুখ 'পরে ক্ষণেক দিয়ে ছায়া, হ'য়ো হে পরিচিত, মিটায়ে খেদ। ২৬।

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মা স্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি ॥ ২৭ ॥

বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগ-শ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্তনাভেঃ ।
নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু ॥ ২৮ ॥
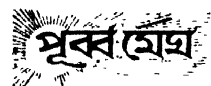
চলেছ উত্তর,   তথাপি বাঁকি' কিছু   উজ্জয়িনী যেও, ছাড়ি' না যাও ;
গগন-ছোঁয়া তার   সৌধ-ছাদ-কোলে   বসিও প্রীতিভরে,   ভুলো না তাও ।
পৌর নারী সেথা   তড়িৎ-লীলা-ভরা   হানিবে সচকিত   নয়ন-রাগ ;
সে চল-দিঠি-সাথে   বিজুলী দিয়ে, সখা,   যদি না খেলো, তুমি   মন্দভাগ । ২৭ ।

ঢেউএর হিল্লোলে   বিহগ রব তুলে'   যাহার 'পরে দোলে   মেখলা পায়,
আবর্ত্তের মাঝে   দেখায়ে চারু নাভি   টলিয়া টলিয়া যে   স্খলিয়া যায়,
সে নির্ব্বিন্ধ্যার   প্রবাহে নামি' তুমি   তাহার রসধারা   করিও পান ;--
এমনি ঠারে-ঠোরে   প্রকাশে কামিনীরা   প্রথম-প্রেম-বাণী   আবেগবান । ২৮

বেণীভূতপ্রতনুসলিলাঽসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ ॥ ২৯ ॥

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাং ।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকং ॥ ৩০ ॥

সিন্ধু তটিনীর সলিল ধারা যেন বেণীর সম ক্রমে হ'য়েছে ক্ষীণ ;
তটের তরু হ'তে জীর্ণ পাতা ঝরি' হয়েছে দেহ তার অতি মলিন ।
তোমারি বিরহেতে মলিনা সে তটিনী, তুমি যে পতি তার ভাগ্যবান ;
বিপুল বরিষণে কৃশতা নাশি' তার করিও তারে তুমি কান্তি দান । ২৯

গ্রামের যত বুড়া যেথায় উদয়ন কাহিনী ব্যাখ্যানিতে নিপুণ খুব,
অবন্তীরে সেই লভিয়া যেও তুমি উজ্জয়িনী পুরী বিশাল-রূপ ।
হেরিলে মনে হ'বে পুণ্য হ'লে ক্ষয় স্বরগ হ'তে চ্যুত যতেক নর
পুণ্য-অবশেষ ছিল যা' তারি বলে স্বরগ রচিয়াছে ধরণী 'পর । ৩০
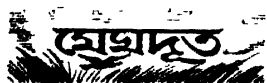
দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনা চাটুকারঃ ॥ ৩১

জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্তোপহারঃ ।
হর্ম্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখিন্নান্তরাত্মা
নীত্বা রাত্রিং ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু ॥ ৩২

শিপ্রানদী-ছোঁয়া শীতল সমীরণ সারস-কলরব বহিয়া লয় ;
ঊষায় বিকশিত কমলে পরশিয়া চলেছে মৃদু মৃদু সুরভিময় ;
কাকলি বহি' বহি' মধুর কথা কহি' হরে সে তরুণীর দেহের ক্লেশ,
যেন রে প্রিয় তার প্রিয়ার প্রীতি মাগে মধুর ভাষে করি' মানের শেষ। ৩১।

পুরায়ো তব দেহ জানালাবাহী ধূমে, যে-ধূমে করে নারী সুরভি কেশ ;
বন্ধু-প্রীতি-ভরে ভবনশিখী দেবে নৃত্য-উপহার তোমারে বেশ।
কুসুম-বাস-ভরা গৃহের মেঝে 'পরে ললিত-বনিতার চরণ-ছাপ
রয়েছে আঁকা কত, সে-সব গৃহ-শিরে কাটায়ে রাত তুমি দূরিও তাপ। ৩২
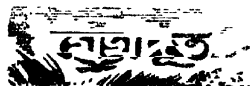
ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং দৃশ্যমানঃ
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডেশ্বরস্য ।
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা-
স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ॥ ৩৩ ॥

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ ।
কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া-
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাং ॥ ৩৪ ॥

শিবের কণ্ঠের সমান নীল তোমা' হেরিবে সমাদরে প্রমথগণ :
ত্রিলোক-গুরু যিনি রুদ্র মহাকাল তাঁহারি পূত ধামে ক'রো গমন
যুবতীদল খেলে গন্ধবতীজলে অঙ্গরাগ-বাস লুটি' পবন
বহিছে কুবলয় গন্ধ মাখি' দেহে মৃদুল দোলা দিয়ে কুঞ্জবন। ৩৩।

যদি সে মহাকাল- সমীপে যাও তুমি থাকিতে দিবসের আলোক-লেশ
রহিও সেথা, মেঘ, যাবৎ দিবাকর উতরি' নাহি যান দৃষ্টি-দেশ।
দেবেশ-শূলপাণি- সন্ধ্যা-পূজা-কালে করিয়া গুরু গুরু গভীর রব
ঢাকের মত যদি নিয়ত বাজো তুমি, সফল হ'বে তব মন্দ্র সব। ৩৪।

পাদন্যাসক্কণিতরশনাস্তত্র লীলাবধুতৈঃ
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্তত্তো নখপদসুখান প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দু-
নামোক্ষ্যন্তি ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥ ৩৫ ॥

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥ ৩৬ ॥

চরণ-তালে-তালে   মেখলা কথা বলে,   কত না সেবিকার   ক্লান্ত কর
দুলায়ে লীলাভরে   চামর মণিময়,—   সে মণি-আভা পড়ে   উদর 'পর।
তাদের দেহে লেখা   যতেক নখরেখা   জুড়াবে পেয়ে তব   বিন্দুজল,
ভ্রমর-সারি সম   কটাক্ষেরে হানি'   হেরিবে তোমা' তারা   গগনতল। ৩৫।

নৃত্যমুখে শিব   ছিঁড়িয়া নাগাজিন   ছুঁড়িয়া লুফি' লন   শোণিতে লাল :
তাঁহার ভুজ ঘেরি'   জবার সম লাল   দাঁড়াবে তুমি যবে   প্রদোষকাল,
অজিন-সাধ তাঁর   মিটিবে তোমা' হেরি'—নৃত্যে মাতিবেন   প্রমথনাথ ;
ভকতি হেরি' তব   তুষ্টা উমা তোমা'   হেরিবে থির চোখে   স্নেহের সাথ। ৩৬

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ ।
সৌদামিন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মা স্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ॥ ৩৭

তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ ।
দৃষ্টে সূর্যে পুনরপি ভবান বাহয়েদধ্বশেষং
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ ॥ ৩৮
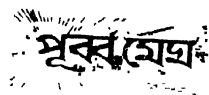
ভেদিতে পারে সূচি এমনি গাঢ়তম নিশায় করিয়াছে পথেরে গ্রাস ;
রমণী একাকিনী চলেছে অভিসারে পূরাতে প্রিয়-পাশে হৃদয়-আশ ।
নিকষে হেম সম নিবিড় তম 'পরে বিজলী জ্বেলে পথ দেখায়ো তা'য় ;
উঠো না গরজিয়া, ঢেলো না বারিধারা, রমণী অসহায়া ভয় যে পায় ; ৩৭ ।

চমকি' ঘন ঘন চপলা বধূ তব যখন হবে শ্রমে ক্লান্তিলীন,
যাপিও রাত ছাদে যাহার তলে গৃহে ঘুমায় পারাবত কূজনহীন ।
উদিলে দিনকর চলিও পুন' তুমি, বাকী যা পথ তব করিও শেষ ;
লইয়ে মিত্রের করম-ভার, কভু সাধু না শিথিলতা দেখায় লেশ । ৩৮ ।

তস্মিন্ কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং
শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু।
প্রালেয়াস্রং কমলবদনাং সোঽপি হর্ত্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্।
তস্মাত্তস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্য্যা-
ন্মোঘীকর্ত্তুং চটুলশফরোদ্বর্ত্তনপ্রেক্ষিতানি ॥ ৪০ ॥

ভানুর পথ তুমি প্রভাতে রুধো নাকো ; হে সখা, সে-সময় প্রণয়ী জন
কাটায়ে রাতি কোথা ফিরিয়া আসি' গৃহে মুছাবে প্রিয়াদের ভিজা নয়ন।
ভানুও আসে নিতি মুছাতে নলিনীর বয়ান হ'তে হিম- নেত্রজল ;
নিরোধ কর যদি তাঁহার কর তুমি জাগিবে তবে তাঁর রোষ প্রবল। ৩৯।

সুধীরা প্রেমিকার তৃপ্ত চিতে যথা ফুটিয়া শোভা পায় প্রেমিক-রূপ,
তেমতি গম্ভীরা- স্বচ্ছ-জল-মাঝে শোভিবে তব দেহ অতি সুরূপ।
কুমুদ সম শাদা শফরী দেয় লাফ, চটুল চোখে যেন তটিনী চায় ;
চপল সে চাহনি ক'রো না নিষ্ফল, থেকো না উদাসীন তুষিতে তা'য়। ৪০

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বং ।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো পুলিনজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥ ৪১ ॥

ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ
স্রোতোরন্ধ্রস্বনিতসুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ ।
নীচৈর্বাস্যত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্ব্বং গিরিং তে
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্ ॥ ৪২ ॥

সে নদী-তীর হ'তে হেলিয়া বেতশাখা পড়েছে জলে,—যেন প্রসারি' কর
ধরেছে নদী নীল- সলিল-বাস তার, যে-বাস শ্লথ তার কটির 'পর।
সে-বাস হরি' তুমি ছাড়ি' কি যাবে তারে? এ হেন হেরি' তারে কেমনে যাও?
রসিকজন যেবা ত্যজিতে সে কি পারে বিপুল-জঘনারে?—জানি তো তাও। ৪১।

তোমার জলে ভেজা মাটীর বাস মাখি' বহিবে যেই বায়ু শীকরময়,
যে-বায়ু পরশনে কানন-ডুম্বুর পাকিয়া বনভূমি সুরভি হয়,
মধুর নাসারবে যে-বায়ু করিগণ নিয়ত করে পান টানি' নাসায়,
বীজন করিবে সে তোমারে ধীরে ধীরে চলিবে যবে দেব- গিরির গা'য়। ৪২।

তত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা
পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ।
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনা-
মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ ॥ ৪৩

জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্রপ্রীত্যা কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি।
ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তং ময়ূরং
পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জিতৈর্নর্তয়েথাঃ ॥ ৪৪

বাসব-বাহিনীরে করিতে রক্ষণ সূর্য্যজয়ী নিজ তেজের ভার
রাখিলা শঙ্কর বহ্নিমুখ 'পরে, সেই সে তেজে জাত তনয় তাঁর
কার্ত্তিকেয় র'ন সে দেবগিরি 'পরে : আকাশ-গঙ্গায় ভিজায়ে, ভাই,
পুষ্পাসার বহ তাহার 'পরে ঢেলো পুষ্পময় দেহে,—পূজা যে চাই। ৪৩।

চিকণ-উজ্জ্বল- বলয়-রেখা-আঁকা কলাপ ভূমি 'পরে খসিলে যার,
ভবানী সুত-স্নেহে তুলিয়া রাখি' দেন কমলদল-পাশে কর্ণে তাঁর ;
যে-শিখী-আঁখি-কোণ হরের শির-শশী কিরণ দিয়ে করে ধবলতর,
নাচায়ো স্কন্দের সে-শিখীটিরে তুমি কাঁপায়ে গুরু গুরু রবে ভূধর। ৪৪

আরাধ্যৈবং শরবণভুবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা

সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্বীণিভির্মুক্তমার্গঃ ।

ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্

স্রোতোমূর্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্তিম্ ॥ ৪৫ ॥

ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে

তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্ ।

প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো দূরমাবর্জ্য দৃষ্টী-

রেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্ ॥ ৪৬ ॥

জাত যে শরবনে   সে দেব ষড়াননে   পূজিয়া সেই পথ   হইও পার ;
সিদ্ধ বীণা হাতে   আপন প্রিয়া সাথে   ছাড়িবে পথ ডরি'   তব   আসার।
রন্তিদেব যশ   ঘোষিয়া বহে যেন   স্রোতের রূপে তার   গোমেধ-যাগ ;
নামিয়া সেথা, ভাই,   দেখায়ো সম্মান,—   হইবে তাহে তুমি   পুণ্যভাক্। ৪৫

শ্যামল-রূপ তুমি   নামিবে যবে সেই   ধবল-নির্ম্মল   জলধারায়
গগনচারী যত   দেবতাগণ সবে   হেরিবে   তটিনীরে   আর তোমায়,—
সুদূর হ'তে চাহি'   নামায়ে দিঠি তারা   বিতত নদীধারা   দেখিবে ক্ষীণ ;
হেরিবে, নদী যেন   ধরণী-বুকে হার, সে হারে তুমি নীল   মাণিক লীন। ৪৬

তামুত্তীর্য্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎ কৃষ্ণসারপ্রভাণাম্ ।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্ব্বন্ দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমধশ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ ।
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যাসিঞ্চন্মুখানি ॥ ৪৮ ॥

সে নদী উত্তরিয়া চলিবে দশপুর, সেথায় বধূদের নয়ন ভায়—
ঊর্দ্ধে হানে দিঠি, বিকশে কালো তারা, নয়ন খেলে ভুরু- ভঙ্গীমায়।
দিঠির পিছে তারা যেন রে কুঁদ ফুল ছুঁড়েছে, তারি পিছে ভ্রমর-দল :
সে-সব আঁখি 'পরে তোমার দেহ ধ'রে মিটায়ো তাহাদের কৌতূহল। ৪৭

ব্রহ্মাবর্ত্তে পুণ্য জনপদে তোমার অধ'-ছায়ে করায়ে স্নান,
ক্ষত্ররণভূমি কুরুক্ষেত্রে সে যেও হে, হানি' যেথা শাণিত বাণ
বিনাশ করেছিলা ক্ষত্ররাজগণে ধরিয়া গাণ্ডীব পার্থ বীর:
যেমন তুমি, মেঘ, কমলবন প'রে নিয়ত হানো তব বৃষ্টি-তীর। ৪৮

হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং
বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে ।
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সোম্য সারস্বতীনাম
অন্তঃশুদ্ধস্ত্বমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥ ৪৯ ॥

তস্মাদ্গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তিম্ ।
গৌরীবক্ত্রভ্রূকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্মিহস্তা ॥ ৫০

বন্ধু-প্রীতি-হেতু আহবে প্রীতিহীন হইয়া হলধর যাহার নীর
করিলা সুখে পান ত্যজিয়া রেবতীর লোচন-বিম্বিত মধু মদির ;
সরস্বতী সেই তটিনী পূত-বারি, সৌম্য মেঘ, তুমি সেবিলে তা'য়,
তোমার হৃদিতল হইবে নিরমল, বাহিরে রবে শুধু কৃষ্ণ কায়। ৪৯

হেরিবে কনখল, শৈলরাজ বাহি' সেথায় জাহ্নবী নিম্নে ধায় ;
সগর-সুতগণে স্বরগে তুলিবারে সোপান-শ্রেণী যেন রচিয়া যায়।
সতীন উমা তারে ভ্রূকুটি করে ব'লে ফেনায় হেসে করে সে উপহাস,
ঊর্ম্মি-করে ছুঁয়ে ভালের শশী-লেখা ধরে সে শম্ভুর কেশের রাশ। ৫০।

তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পূর্ব্বার্দ্ধলম্বী
ত্বঞ্চেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তির্য্যগম্ভঃ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসিচ্ছায়য়া সা
স্যাদস্থানোপনতযমুনাসঙ্গমেবাভিরামা ॥ ৫১ ॥

আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্মৃগাণাং
তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ।
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ
শোভাং রম্যাং ত্রিনয়ন-বৃষোৎখাত পঙ্কোপমেয়াম ॥ ৫২ ॥

স্ফটিক-নিরমল শুভ্র সেই জল, বারিবাহ, তুমি করিতে পান
তোমার দেহটিরে ঐরাবত সম শূন্য হ'তে করি' লম্বমান,
জাহ্নবীর বুকে ঝুঁকিয়া পড় যদি তাহার জলে তব কৃষ্ণ ছায়
যমুনা-ধারা সম শোভিবে, মনে হবে মিলেছে যমুনা ও গঙ্গায়। ৫১।

শায়িত হরিণের নাভির বাস লাগি' যেথায় সুরভিত শিলাস্তূপ,
সে-গিরি অচলেরে লভিবে পরে তুমি তুষারে সদা সে যে ধবল-রূপ।
হরের শাদা বৃষ পঙ্ক খুঁড়' যথা শৃঙ্গে আপনার মাখায়ে ছায়,
পঙ্ক সম তুমি শোভিবে মনোরম জিরাবে যবে শাদা গিরির গায়। ৫২

তঞ্চেদ্বায়ৌ সরতি সরলস্কন্ধসংঘট্টজন্মা।
বাধেতোল্কাক্ষপিতচমরীবালভারো দবাগ্নিঃ
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহস্রৈ-
রাপন্নার্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্ ॥ ৫৩ ॥

যে ত্বাং মুক্তাধ্বনিমসহনাঃ কায়ভঙ্গায় তস্মিন্
দর্পোৎসেকাদুপরি শরভা লঙ্ঘয়িষ্যন্ত্যলঙ্ঘ্যাম্।
তান্ কুর্বীথাস্তুমুলকরকাবৃষ্টিহাসাবকীর্ণান্
কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ ॥ ৫৪ ॥

পবনে দেবদারু ঘসিয়া কাঁধে কাঁধে সেথায় যদি রচি' কাননানল
উল্কা দিয়ে জ্বালে চমরী-রোমজাল তবে তো বিচলিত হিম-অচল,—
তখন তুমি, মেঘ, হাজার ধারা দিয়ে নিবায়ো দাবানল, মহৎ জন
আর্তে রাখিতে নিয়োগ করে সদা যতেক সম্পদ, গুণ আপন। ৫৩।

তোমারে লঙ্ঘিতে সহজ নহে তবু দর্পভরে যদি শরভ-দল
তোমার ধ্বনি শুনি' লাফায়ে পড়ি' সেথা অঙ্গ ভাঙি' ফেলে শিলার তল,
তুমুল শিলাপাতে করিও উপহাস মূর্খ মৃগগণে অবিশ্রাম;
না হেরি' পরিণাম যাহারা করে কাজ লভে যে অপমান—ব্যর্থকাম। ৫৪

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপহৃতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্দ্ধ্বমুদ্ধূতপাপাঃ
কল্পন্তেঽস্য স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ ॥ ৫৫ ॥

শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ
সংরক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রাদী তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরাসু ধ্বনিঃ স্যাৎ
সঙ্গীতার্থো নন্থ পশুপতেস্তত্র ভাবী সমস্তঃ ॥ ৫৬ ।

সেই সে হিমাচলে শিখরে শিলাতলে বিরাজে মহেশের চরণ-দাগ,
সিদ্ধগণ সবে নিয়ত তারে পূজে ; ভক্তিভরে হ'তে পুণ্যভাক্
পূজিও তারে তুমি বেড়িয়া বার বার ; সে-পদ হেরি' সদা ভক্ত নর
কলুষ হ'তে তরে, ত্যজিয়া মর দেহ অমর দেহে হয় শিবানুচর। ৫৫।

কীচক-বেণু সেথা অনিল-পরশনে মধুর বাজি' উঠে মুরলী প্রায় :
যতেক কিন্নরী নৃত্য সাথে সদা ত্রিপুরজয়ী-শিব- কীর্ত্তি গায়।
মন্দ্র তব, মেঘ, ভূধর-কন্দরে ধ্বনিয়া যদি তোলে মুরজ-রব,
তবে সে-সঙ্গীত মিলিয়া একতানে হবে যে সঙ্গত অঙ্গে সব। ৫৬

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্ ।
তেনোদীচীং দিশমভিসরেস্তির্যগায়ামশোভী
শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ ॥ ৫৭

গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥ ৫৮ ॥

হেরিয়া বস্তু-রূপ অচল-মহিমায় লভিবে ভার্গব- কীর্ত্তি-পথ
ক্রৌঞ্চরন্ধ্র সে, বলাকা সেই পথে প্রবেশি' চ'লে যায় মানস হ্রদ।
চলিতে উত্তর সে-পথে প্রবেশিও তোমার দেহটি রে হেলায়ে, ভাই,
বলিরে ছলিবারে বিষ্ণু-শ্যাম-পদ যেমন হেলেছিল, শোভিবে তাই। ৫৭

ঊর্দ্ধে উঠি' কিছু হেরিবে কৈলাস—রাবণ-ভুজ-বলে শিথিল-মূল,
অমর-নারীদের যেন সে দর্পণ, অতিথি হ'য়ো তার, সে যে অতুল।
ব্যাপিয়া নভতল কুমুদ সম শাদা শিখর তোলে গিরি অতি ধবল ;
শিবের রাশীভূত অট্টহাস যেন জমিয়া রচিয়াছে গিরি অচল। ৫৮।

উংপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে
সদ্যঃ কৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদগৌরস্য তস্য।
লীলামদ্রেঃ স্তিমিতনয়ন-প্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী-
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব ॥ ৫৯

হিত্বা নীলং ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিহরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলোহস্যাঃ
সোপানত্বং কুরু সুখপদস্পর্শমারোহণেষু ॥ ৬০ ॥

সদ্যছিন্ন যে দ্বিরদ-রদ সম শুভ্র গিরিবর সে কৈলাস ;
কাজল-কালো তুমি স্নিগ্ধ রূপে যবে লাগিয়া রবে তার সানুর পাশ,
তখন মনে হবে গৌর হলধর শ্যামল বাস কাঁধে, দীপ্যমান ;
যে-চোখ হেরিবে তা' নিমেষহীন হবে অতুল সেই শোভা করিয়া পান । ৫৯

গৌরী যদি সেথা ধরিয়া মহেশের সাপের-বালা-খোলা শোভন কর
ভ্রমেন সুখভরে ক্রীড়ার পর্ব্বতে করিয়া পদচার সুমন্থর,
তোমার জলবেগ বুকেতে চাপি' রাখি' তাঁহার পদতলে করি' শয়ন
ভকতি ভরে তুমি সোপান সম হ'য়ো, গৌরী ফেলিবেন সুখে চরণ । ৬০ ।

তত্রাবশ্যং জনিতসলিলোদ্গারমন্তঃপ্রবেশান
নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বং ।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে ঘর্ম্মলব্ধস্য ন স্যাৎ
ক্রীডালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জিতৈর্ভায়য়েস্তাঃ ॥ ৬১ ॥

হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
কুর্ব্বন্ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবণস্য ।
ধুন্বন্ বাতৈঃ সজলপৃষতৈঃ কল্পবৃক্ষাংশুকানি
ছায়াভিন্নঃ স্ফটিকবিশদং নির্বিশেঃ পর্ব্বতং তম ॥ ৬২

সেথায় গৃহ-মাঝে   প্রবেশি' যবে তুমি   ঝরাবে ঝুরুঝুরু   শীকর-জাল,
অমর-যুবতীরা   ফোয়ারা সম তোমা'   ধরিয়া রাখি' সুখে   কাটাবে কাল ;
নিদাঘে জরজর   তাহারা, পেয়ে তোমা'   ছাড়িতে চাবে নাকো সহজে আর ;
ভীষণ নিনাদিয়া   তাদেরে চমকিয়া   ভাঙায়ে দিও লীলা,   হ'য়ো হে বার। ৬১।

মানস-জলে ফোটে   কনক-পঙ্কজ,   সে জল ক'রো পান,   হে জলধর,
তুষিও ক্ষণকাল   ঐরাবতে তুমি   শীতল বাস হ'য়ে   বদন 'পর।
শীকরময় বায়ে   কল্প-বৃক্ষের   কাঁপায়ো কিশলয়   অতীব ক্ষীণ ;
তুমি ও তব ছায়া   দোঁহায় করো ভোগ   শুভ্র গিরিবরে   মহিমালীন। ৬২
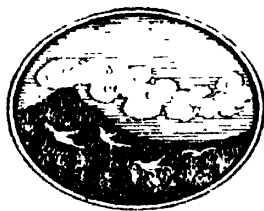
তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্ ।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গারমুচ্চৈর্বিমানা
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্ ৬৩

দেখোনি তারে তবু   তুমি যে কামচারী,   চিনিয়া লবে তুমি   সে-অলকায়—
কৈলাসের কোলে   যেন সে প্রণয়িনী,   গঙ্গা-বাস তার   খসিয়া যায়।
কামিনীগণ-শিরে   যেমন শোভা পায়   মুকুতা-জালে-গাঁথা   কেশ-কলাপ,
তেমনি বরষায়   উচ্চ শিরে তার   শোভিছে জলঝরা   মেঘের চাপ ॥ ৬৩।

শেষ

উত্তরমেঘ

বিদ্যুদ্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্ ।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥ ১ ॥

হস্তে লীলাকমলমলকং বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননশ্রীঃ ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥ ২ ॥

তুলনা করি যদি   মিলিবে তব সাথে   প্রাসাদগুলি, ভাই, সে অলকার,-
তোমাতে বিদ্যুৎ,   ললিত নারী সেথা,   ইন্দ্রচাপ তব, চিত্র তার ;
গীতির সাথে সেথা   মুরজ বাজি' উঠে,   স্নিগ্ধ-গম্ভীর   তোমার রব,
তোমার বুকে জল,   মণির মেঝে সেথা,   উচ্চ তুমি, উঁচু   শিখর সব। ১

সেথায় বধূদের   হস্তে শোভা পায়   কত না কমনীয়   লীলাকমল,
অলকে নবফোটা   কুন্দ রহে বেঁধা,   লোধ্র-রেণু মেখে   মুখ ধবল ;
তাদের চূড়া-পাশে   নূতন কুরুবক,   শ্রবণে মনোরম   শিরীষ ফুল,
সীঁথিতে তারা সবে   তোমারি বিকশিত   কদম-ফুল পরি'   শোভে অতুল। ২

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পাঃ
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ ॥ ৩ ॥

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥ ৪ ॥

নিত্য ফোটে সেথা   পাদপে ফুল-দল,   মত্ত অলি করে
নলিনী শত দলে   নিত্য ঝলমলে,   মেখলা সম বসে   মরালগণ।
ভবনশিখী সেথা   কলাপ বিথারিয়া   নিত্য কেকা-রবে নৃত্যপর ;
প্রদোষকালে নিতি   সেথায় হরে তম   শুভ্র রমণীয়   শশীর কর। ৩

সেথায় আঁখিজল   হরষে ঝরে শুধু —   কাহারো চিত নহে   দুঃখময় ;
মদন-শরে শুধু   দহে যে অন্তর   ইষ্ট জনে পেয়ে   তুষ্ট হয়।
প্রণয়-কলহেতে   বিরহ ঘটে শুধু,   নাহিক বিরহের   কারণ আন ;
যক্ষদের নাহি   বয়স কোনো আর,   কেবল যৌবন   কান্তিমান। ৪।

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্মস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচনান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ ।
আসেবন্তে মধুরতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং
ত্বদগাম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু ॥ ৫

মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি-
র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥ ৬

তারার ছবি পড়ি'   মণির গৃহ-শিরে   ফুটেছে যেন ফুল,   তুলনা নাই ;
তোমার নির্ঘোষে   সেথায় ধীর ভাষে   বাজিবে পাখোয়াজ   যেমনি, ভাই,
যক্ষগণ তবে   অতুলা   নারী লয়ে   সেথায় উল্লাসে   করিবে পান
কল্পদ্রুম জাত   প্রীতির মধু-ভরা   স্বরগ-সুধা-রস—   মত্তপ্রাণ। ৫।

মন্দাকিনী-ছোঁওয়া   শীতল সমীরণ   সেথায় বহে যাবে মৃদুল ধীর,
দেবতা-বাঞ্ছিতা   যক্ষ-তনয়ারা   মন্দারের তলে   নদীর তীর
শোভিয়া, করে লয়ে   রতন মুঠি মুঠি   ছুঁড়িয়া ফেলি' দেয়   বালুকা'পর,
হারানো মণি পুন'   খুঁজিয়া করে বার,   এমনি চলে খেলা   নিরন্তর। ৬।

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসনশিথিলং যত্র যক্ষাঙ্গনানাং
বাসঃ কামাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু ।
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্ন-প্রদীপান্
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফল-প্রেরণশ্চূর্ণমুষ্টি ॥ ৭

নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমী-
রালেখ্যানাং নবজলকণৈর্দোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ ।
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈ-
র্ধূমোদগারানুকৃতিনিপুণং জর্জ্জরা নিষ্পতন্তি ॥ ৮

সেথায় প্রিয়গণ সোহাগে প্রিয়াদের টানিয়া ল'তে চায় দেহের বাস ;
চপল করে যবে নীবীর বন্ধনে খুলিয়া ফেলি' দেয় ছড়ায়ে হাস,
সরমে নারীগণ নিবাতে আলো তবে ফাগের মুঠি ছোঁড়ে দীপ-শিখায় :
সে কাজ বৃথা হায়, নেবে না মণি দীপ ঘুচাতে রমণীর সে-লজ্জায়। ৭।

সেথায় অলকায় উচ্চতম গৃহে প্রবেশি' তব সম জলদ-দল,
বরষি' জল-কণা চিত্রাবলী যত করিয়া অপচয় ভয়-বিকল
পলায় ত্বরা তারা জানালা-পথ দিয়া, জানিতে পারে পাছে গৃহের লোক
ধূমের সম করি' দেহেরে জরজর উঠিয়া পড়ে তারা আকাশ-লোক। ৮।

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজালিঙ্গনোচ্ছ্বাসিতানা-
মঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চোতিতাশ্চন্দ্রপাদৈ-
র্ব্যালুম্পন্তি স্ফুটজললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ॥ ৯

অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ-
রুদ্গায়দ্ভির্ধনপতিযশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্দ্ধম্।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়াঃ
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্বিবশন্তি॥ ১০

চন্দ্রাতপে সেথা   মণির মালা ঝোলে,   তাহাতে মেঘহীন   চাঁদের কর
নিশীথে শোভা পায়,   সে-মণিমালা হ'তে   ঝরিয়া ঝিরিঝিরি   জল-শীকর
হরিছে অবিরাম   প্রিয়ের বাহু-পীড়া-   পীড়িতা রমণীর   দেহের ক্লেশ,
যখন তারে প্রিয়   শিথিল করি' বাহু   ছাড়িয়া দেয় হ'তে   বক্ষদেশ। ৯।

অশেষ নিধিচয়   যাদের গৃহে রয়   বিলাসীগণ হেন   নিতি সেথায়
কুবের-যশোগীতি-   গায়ক সুস্বর   যতেক কিন্নরে   করি' সহায়,
লইয়া মনোহরা   বনিতা অপ্সরা   বাহিরি' নগরীর   সীমার শেষ
কানন বৈভ্রাজে   বিহরে তারি মাঝে,   পরম সুখে কাল   কাটায় বেশ। ১০।
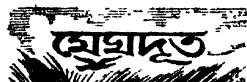
গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
ক্লৃপ্ত্যচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ ।
মুক্তালগ্নস্তনপরিমলৈশ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈ-
র্নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম ॥ ১১

মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্বসন্তং
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্‌পদজ্যং ।
সভ্রূভঙ্গপ্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষ্বমোঘৈ-
স্তস্যারম্ভশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ ॥ ১২

গতির দোলনেতে অলকভার হ'তে ঝরিয়া মন্দার ধূলায় রয় ;
শ্রবণ হ'তে ঝরি' শিথিল রহে পড়ি' কমল কিশলয় কনক-ময় ;
ছিন্ন হার হ'তে স্তনের রাগ-মাখা মুকুতা রহে ভূমে,—প্রভাতে তা'য়
হেরিয়া বুঝি' লবে কামিনী কোন্ পথে নৈশ অভিসারে নিয়ত ধায়। ১১।

কুবের-বান্ধব মহান্ মহাদেব রহেন সেথা, তাই সভয় কাম
ধরিয়া ফুলধনু মধুপ-ছিলা' পরে জুড়িতে ফুল-শর নিয়ত বাম।
তথাপি মদনের মনের অভিলাষে নারীর আঁখি 'পরে সফল হয়,
বনিতা সুচতুরা অমোঘ লীলা-ভরা দৃষ্টি দিয়ে জিনে কামী-হৃদয়। ১২

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং
পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিশলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ যস্যা-
মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ ॥ ১৩ ॥

তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন।
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্দ্ধিতো মে
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ ॥ ১৪ ॥

কল্পতরু একা সেথায় করে দান যতেক অবলারে দিতে হরষ—
বসন বহুবিধ, নয়নে বিভ্রম জাগাতে সুনিপুণ মধুর রস ;
দেহের আভরণ করিতে কত ফুল তাহার সাথে নব পত্র-দল,
লাক্ষারাগ দেয় অতীব মনোরম করিতে সুশোভিত পদ-কমল। ১৩

এ হেন অলকায় কুবের-গৃহ হ'তে রহে যে উত্তরে আমার ঘর ;
তাহারে দূর হ'তে চিনিবে হেরি' চারু ইন্দ্রধনু সম তোরণবর।
গৃহের পাশে শোভে তরুণ মন্দার, পালিত সুত যেন মোর প্রিয়ার,
তাহারি স্নেহে গড়া, স্তবকে নত তরু, হস্তে ধরা যায় স্তবক-ভার। ১৪
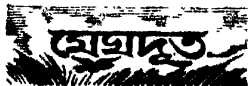
বাপী চাস্মিন্মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধ-বৈদূর্য্যনালৈঃ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥ ১৫

তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টনপ্রেক্ষণীয়ঃ।
মদ্গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে চেতসা কাতরেণ
প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥ ১৬ ॥

সরসী শোভে সেথা, গঠিত মরকতে দীপ্তি পায় তার সোপান-চয় ;
ঢাকিয়া তার জল স্বর্ণ-শতদল বৈদূর্য্যের নালে বিকচ রয় ।
সে-জলে সুখভরে মরাল কেলি করে, তোমারে হেরিয়াও নহে ব্যাকুল,
মানসে যেতে আর মানস করিবে না, যদিও নিকটেতে মানস-কূল । ১৫ ।

ক্রীড়ার গিরিবর বিরাজে তীরে তার— ইন্দ্রনীলমণি- গঠিত শির ;
কনক-কদলীর বৃক্ষ ঘেরে তারে, শোভন গিরি প্রিয় সে প্রেয়সীর ।
প্রান্তভাগে তব তড়িৎ জ্বলজ্বল হেরিলে মনে পড়ে শৈল সেই ;—
স্মরিলে তার কথা কাতর চিত অতি, আমার বেদনার সীমা যে নেই । ১৬
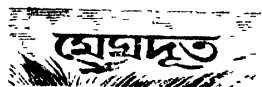
রক্তাশোকশ্চলকিসলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য ।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ১৭ ॥

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টিঃ
মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ ।
তালৈঃ শিঞ্জদ্বলয়সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ ॥ ১৮

সেথায় কুরুবকে ঘিরেছে মাধবীর কুঞ্জ, তারি পাশে দুইটি গাছ ;—
অশোক তরু রয় কাঁপায়ে কিশলয়, বকুল মনোরম করে বিরাজ।
আমার সাথে মোর প্রিয়ার বামপদ- তাড়ন পেতে সেই অশোক চায় ;
বকুল কুতূহলে দোহদ-ছলে চাহে প্রিয়ার বদনের সুরা-ধারায়। ১৭।

সে দু'টি তরু মাঝে স্ফটিক-ফলকেতে সোনার খোঁটা পোঁতা, গোড়ায় তার
নবীন বাঁশ সম প্রভায় অনুপম খচিত মণিরাশি চমৎকার।
দিবস-অবসানে তোমার প্রিয় সখা কলাপী নীল-গ্রীবা নিবসে তায় ;
প্রিয়ার করতালে নাচে সে তালে তালে, বলয় রুণুঝুনু মৃদুল গায়। ১৮।
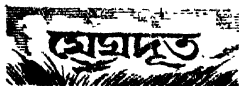
এভিঃ সাধো হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষণীয়ং
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং
সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্ ॥ ১৯ ॥

গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাত-হেতোঃ
ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্যসানৌ নিষণ্ণঃ।
অর্হস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্ত্তুমল্পাল্পভাসং
খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্ ॥ ২০

হে সাধু জলধর, গৃহের পরিচয় দিনু যা' তাহা তব হৃদয়ে থাক্ ;
দ্বারের একপাশে পদ্ম রহে আঁকা অপর পাশে আঁকা হেরিয়া শাঁখ
চিনিয়া লবে তুমি আমার গৃহটিরে— বিরহে মোর তাহা কিছু মলিন ;
জান তো দিবাকর অস্তাচলে গেলে কমল হয় সদা কান্তিহীন। ১৯।

তরুণ গজপ্রায় ক্ষুদ্র ক'রো কায় ত্বরিত প্রবেশিতে ভবনে মোর :
ক্রীড়ার গিরি-পাশে রম্য সানুদেশে বসিও বিদূরিতে শ্রমের ঘোর।
যেমন থাকি' থাকি' জোনাকি জ্বলি' উঠে, তেমনি মেলি' তব তড়িৎ-চোখ
হেরিও মিটিমিটি গৃহের মাঝে মোর, ফেলিয়া সেথা মৃদু তড়িতালোক। ২০।

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণপ্রেক্ষণী নিম্ননাভিঃ ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্‌যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥ ২১ ॥

তাং জানীয়াঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম ।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বাহন্যরূপাং ॥ ২২ ॥

সেথা যে কৃশ-তনু তরুণী হিরণাভা, দশনগুলি যেন মুকুতা-দানার,
বিম্বাধরা যেবা, মাঝাটি অতি ক্ষীণ, চকিত হরিণীর নয়ন যার,
গভীর নাভি, তনু স্তনেতে কিছু নত, শ্রোণীর ভারে ধীরে অলস যায়,
ধাতার গড়া যেন প্রথম যুবতী সে আমার প্রিয়তমা অতুল ভায়। ২১

তাহার মুখে, ভাই, বেশী যে কথা নাই, জানিও তারে মোর দ্বিতীয় প্রাণ ;
আমি এ সহচর সুদূরে এলে পর চক্রবাকী সম একাকী ম্লান।
গভীর উদ্বেগে দিবস যেন তার অতীব গুরু, নাহি কাটিতে চায় ;
শিশির-বিমথিত যেন সে কমলিনী, তাহার রূপে পড়ে মলিন ছায়। ২২।

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং বহূনাং
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরৌষ্ঠম্ ।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদুপসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্ত্তি ॥ ২৩ ॥

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী ।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥ ২৪

প্রবল আঁখিজল ঝরিয়া অবিরল ফুলায়ে দেছে তার দু'টি নয়ন ;
ওষ্ঠাধর তার হয়েছে পাণ্ডুর নিশাস-তাপ লেগে অনুক্ষণ ;
ঝুলিয়া কেশরাশি ঢেকেছে মুখশশী, সে মুখ করতলে ন্যস্ত রয় ;
আধেক যায় দেখা, যেমন তুমি, সখা, ঢাকিলে চন্দ্রমা যে-শোভা হয়। ২৩

হয়ত হেরিবে সে রয়েছে পূজারতা— আমারি শুভ মাগে দেবতা-পাশ।
অথবা আঁকে বসি' বিরহী মোর ছবি কল্পনায় লভি' তারি আভাস ;
হয়ত পিঞ্জর- নিবাসী মধুভাষী সারীরে কহে সেই মধুর বাক্,—
"রসিকা লো সারিকা, মনে কি পড়ে তারে, করিত যেবা তোরে অতি সোহাগ?" ২৪

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সোম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা ।
তন্ত্রীরার্দ্রা নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্-
ভূয়ো ভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী ॥ ২৫ ॥

শেষান্মাসান্ গমনদিবসপ্রস্তুতস্যাবধের্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ ।
সংযোগং বা হৃদয়নিহিতারন্তমাস্বাদয়ন্তী
প্রায়েণৈতে রমণবিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ ॥ ২৬

মলিন-বসনা সে হয়ত প্রিয়তমা আমারি নামে রচি' ব্যথার গীত,
বীণাটি লয়ে কোলে সে-গীতি গাহিবারে হতেছে উন্মুখ স্বর-সহিত ;
নয়ন-বারিধার ভিজায় বীণা-তার, মাজিয়া বীণা পুন' গাহিতে চায় ;
হায় রে বৃথা চাহে, ভুলিছে বারবার আপন হাতে তোলা মূর্চ্ছনায়। ২৫ ।

বিরহ-দিন হতে প্রেয়সী প্রতিদিন দ্বারের পাশে রাখে একটি ফুল ;
বিরহ-অবসানে বাকী বা কয় মাস কুসুম গণি' দেখে বিরহাকুল ।
অথবা হিয়া-মাঝে মূরতি আঁকি' মম করে সে উপভোগ মিলন-সুখ ;
এমনি বিরহিণী নিয়ত মনে মনে পতির ধ্যানে ভুলে বিরহ-দুখ। ২৬।
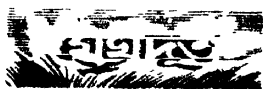
সব্যাপারামহনি ন তথা খেদয়েদ্বিপ্রয়োগঃ
শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্ব্বিনোদাং সখীং তে
মৎসন্দেশৈঃ সুখয়িতুমতঃ পশ্য সাধ্বীং নিশীথে
তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাসন্নবাতায়নস্থঃ ॥ ২৭ ॥

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্দ্ধমিচ্ছারতৈর্যা
তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্ ॥ ২৮ ॥

দিবসে নানা কাজে ততটা নাহি বাজে তাহার হিয়া-মাঝে বিরহ মোর ;
নিশায় বেদনায় বুক যে ফেটে যায়, তাহার যাতনার নাহিক ওর ।
নয়নে নাহি ঘুম, অবনী-শয্যায় জানালা-পাশে রহে করি' শয়ন ;
তখন বাতায়নে বসিয়া, সখা, তা'য় বারতা দিয়ে মোর তুষিও মন । ২৭ ।

বিরহ-শয্যায় হেরিবে কৃশকায় প্রেয়সী এক পাশে করিয়া ভর ;
যেন রে কলা-শেষ ইন্দু রহে পড়ি' প্রভাতে প্রাচীমূলে মলিন-কর ।
বিহরি' সুখ-সাধে আমার সনে নিতি ক্ষণেক সম যার কাটিত রাত,
বিরহ-রাতি তার কাটে না যেন আর, করে সে তাপময় অশ্রুপাত । ২৮ ।
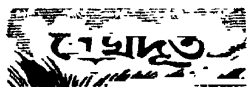
পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্

পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব ।

চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং

সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্ ॥ ২৯

নিশ্বাসেনাধরকিশলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীম্

শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্ ।

মৎসংযোগঃ কথমুপনমেৎ স্বপ্নজোঽপীতি নিদ্রা-

মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্ ॥ ৩০ ॥

শীতল সুধাময় ইন্দু-কর যবে জানালা-পথে করে ঘরে প্রবেশ,
পূর্ব্ব-প্রীতি-ভরে নয়ন দু'টি তার পাঠায়ে তারি পানে, লভিয়া ক্লেশ,
সলিল-ভারে নত পক্ষ্মজাল দিয়া ঢাকে সে আপনার আঁখি-যুগল ;
যেমন জলধর ঢাকিলে দিবসেরে না ফুটে নাহি মুদে স্থল-কমল। ২৯।

রুক্ষ স্নানে তার অলক অচিকণ, ঝুলিয়া রহে তাহা গণ্ড 'পর,
দোলায়ে সে-অলক দীরঘ শ্বাস তার দহিছে কিশলয় সম অধর।
নিদ্রা মাগে প্রিয়া স্বপনে যদি মিটে আমার সাথে তার মিলন-সাধ :
অশ্রু-স্রোত আসি' নিদ্রা-পথ রোধে, তাহার সুখ সাধে ঘটায় বাদ। ৩০
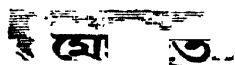
আদ্যে বদ্ধা বিরহদিবসে যা শিখাদাম হিত্বা
শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা যা ময়োন্মোচনীয়া।
স্পর্শক্লিষ্টাময়মিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং
গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমাদেকবেণীং করেণ ॥ ৩১ ॥

সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেলবং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্‌।
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং
প্রায়ঃ সর্ব্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা ॥ ৩২ ॥

মোদের বিরহের প্রথম দিনে বালা বেঁধেছে যেই বেণী চূড়া-বিহীন,
খুলিব আমি তারে হরষে সুখভরে বিগত হ'লে পরে বিরহ-দিন।
হয়ত প্রিয়া মোর শুষ্ক রাগহীন গণ্ড হ'তে তার বার বার
নখর-যুত করে রুক্ষ এক-বেণী সরায়, ক্লেশকর পরশ তার। ৩১।

হয়ত মোর, ভাই, প্রেয়সী অবলার ভূষণহীন সেই দেহ কোমল
অশেষ বেদনায় নহেক থির কভু, লুটায় বারবার শয্যাতল।
হেরে সে দুখিনীরে কাঁদিয়া জলধারে সদয় হ'য়ো তুমি কোমল-বুক ;
করুণাময় যারা তাদের চিত্ত সদা আপনি গলি' যায় হেরিয়া দুখ। ৩১

জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মা-
দিত্থম্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি ।
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষং তে নিখিলমচিরাদ্ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ ॥ ৩৩

রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপিচ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্ ।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যাঃ
মীনক্ষোভাকুলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥ ৩৪

আমার প্রিয়তমা কত যে মনে-প্রাণে আমারে ভালবাসে জানি তো, ভাই ;
প্রথম বিরহিণী মূরতি তার আমি আঁকিনু মনে মনে এমনি তাই।
প্রণয়-ভাগ্যের বড়াই নাহি করি, বলিনু বহু বটে, বাচাল নই ;
সকলি নিজ চোখে অচিরে তুমি, ভাই, হেরিবে যাহা আমি তোমারে কই। ৩৩।

কাজলহীন তার চোখের কোণ দু'টি ঢাকিয়া দেছে ঝুলে অলক-জাল ;
মদিরা পান আর করে না তাই তার ভুরুর লীলা নাহি খেলায় ভাল।
নিকটে হেরি' তোমা' হরিণ-আঁখি তার উপরে দিঠি হানি' হবে অথির,—
শোভিবে আঁখি দু'টি— কমল কাঁপে যেন মীনের গতি লেগে মৃদুল ধীর ! ৩৪।

বামশ্চাস্যাঃ কররুহপদৈর্মুচ্যমানো মদীয়ৈ-
র্মুক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসংবাহনানাং
যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্ ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ কালে জলদ দয়িতা লব্ধনিদ্রা যদি স্যা-
দন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্ ॥ ৩৬

দিতাম নখে কাটি, প্রিয়ার বাম উরু, আজিকে নাহি সেথা নখের দাগ ;
মুকুতা জালে তাহা আবৃত র'ত নিতি, নাহিক সেথা আজি মুকুতা রাগ ;
ক্লান্তি বিদূরিতে যে বাম উরু 'পরে বুলায়ে কর আমি দিতাম, সেই
কদলী-তরু সম গৌর উর-দেশ কাঁপিবে মৃদু, তোমা' হেরিবে যেই। ৩৫।

যদি সে সে-সময় নিদ্রাগত রয়, বসিয়া তার পাশে, হে জলমুক্,
প্রহর-কাল তুমি নীরব থেকো, ভাই, ক'রো না গরজন ভাঙায়ে সুখ।
হয়ত স্বপনে সে আমারে লভি' বুকে জড়ায় ভুজ-লতা কণ্ঠে মোর ;
হেন কালে যদি ডাকিয়া উঠ তুমি, শিথিল হবে দৃঢ় বাহুর ডোর। ৩৬
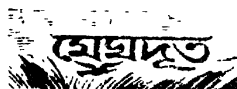
তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন
প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্ ।
বিদ্যুদ্গর্ভে নিহিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে
বক্তুং ধীরস্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ॥ ৩৭ ॥

ভর্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে বিদ্ধি মামম্বুবাহং
তৎসন্দেশান্মনসি নিহিতাদাগতং ত্বৎসমীপম্ ।
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং
মন্দ্রস্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলা বেণিমোক্ষোৎসুকানি ॥ ৩৮

তোমার জলকণা- শীতল অনিলের পরশে ধীরে ধীরে তুষিয়া তা'য়,
মালতী-কলিকার বিকাশ সাথে তুমি জাগায়ে দিও, ভাই, মোর প্রিয়ায়
বসিয়া বাতায়নে খেলায়ো চপলায়,—অমনি হেরিবে সে তুলিয়া চোখ,
তখন মানিনীরে মৃদুল স্বরে তুমি বলিও এই কথা দূরিতে শোক ৩৭।—

"সধবা, শোন তুমি, অম্বুবাহ আমি তোমার ভর্ত্তার সখা যে হই ;
বারতা বহি' তার এসেছি বহু দূর, তোমার পাশে আজ সে-কথা কই
স্নিগ্ধ ধ্বনি মোর শুনিয়া করিবারে আপন প্রিয়াদের বেণী মোচন
যতেক পরবাসী প্রণয়ী সুখভরে ত্বরিত পদে যায় গৃহে আপন।" ৩৮
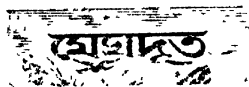
ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা
ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈব ।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য সীমন্তিনীনাং
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপনতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিদূনঃ ॥ ৩৯

তামায়ুষ্মন্মম চ বচনাদাত্মনা চোপকর্ত্তুং
ব্রূয়া এবং তব সহচরো রামগির্য্যাশ্রমস্থঃ ।
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ
পূর্ব্বাশাস্যং সুলভবিপদাং প্রাণিনামেতদেব ॥ ৪০ ।

মারুতি-মুখে যথা শুনিয়া রাম কথা জানকী উন্মুখ হেরিল তাঁয়,
তেমনি সমাদরে তোমারে জলধর, হেরিবে প্রিয়া মোর আকাশ-গায়।
তোমারে হিয়া-মাঝে বরণ করি' প্রিয়া শুনিবে দিয়ে মন তব বচন ;—
মিত্র-মুখে শোন' প্রিয়ের শুভ বাণী মিলন প্রায় মানে অবলাগণ। ৩৯।

আমার অনুরোধে অথবা তুমি তার সাধিতে উপকার ব'লো এ ভাষ—
"তোমার সহচর কুশলে রহে জেনো,—সে রামগিরি 'পরে করিছে বাস।
দুঃখ শুধু তার বিচ্ছেদের ভার, আমার মুখে তব কুশল চায় ;—
প্রাণীরা পদে পদে পড়ে যে প্রমাদে, কুশল তাই সবে আগে শুধায়। ৪০

অঙ্গেনাঙ্গং তনু চ তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং
সাস্রেণাস্রদ্রবমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন ।
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্তী
সঙ্কল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥ ৪১ ॥

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তা
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ ।
সোঽতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামগম্য-
স্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ ॥ ৪২ ॥

“আপনি কৃশ তাই ভাবিছে তুমি কৃশ, আপনি তাপী, ভাবে— তুমিও তাই ;
নয়নে ঝরে জল, ভাবিছে অবিরল তোমারো আঁখি ঝরে— বিরাম নাই।
উষ্ণ শ্বাসে দহে, ভাবিছে তুমিও তা, — এমনি মনে মনে মিলায়ে লয়
অঙ্গ সব তার তোমার অঙ্গেতে, নিকট-মিলনে যে বিধি নিদয়। ৪১।

“যে কথা সখীদের সমুখে বলা যায়, বদন পরশিতে করিয়া লোভ,
বলিতে চাহিত যে সে-কথা কানে কানে, আজি সে পতি তব লভিয়া ক্ষোভ
শ্রবণাতীত রহে দৃষ্টি হ'তে দূরে ; আমার মুখে আজ পাঠায় এই
বারতা তব তরে বিরহ-ব্যথা-ভরা, অতীব উদ্বেগে কাতর সেই। ৪২।—
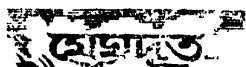
শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্তচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্থং ক্বচিদপি ন তে ভীরু সাদৃশ্যমস্তি ॥ ৪৩ ॥

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুং।
অস্ত্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥ ৪৪ ॥

"তোমার অঙ্গের হেরিতে পেলবতা শ্যামা সে লতিকার পাশে যে যাই ;
চন্দ্রে হেরি, প্রিয়া, তোমারি মুখছবি, হরিণী-চোখে তব নয়ন পাই ;
শিখীর কলাপেতে তোমার কেশভার. নদীর ঢেউ এ তব ভুরু-বিলাস ;
তথাপি এক ঠাঁই কভু না হেরি, সখি, তোমার সে মূরতি, সে লীলা হাস। ৪৩

"কুপিতা তুমি যেন রয়েছ মানভরে,— শিলায় ধাতুরাগে আঁকিয়া, সই,
যেমন আপনারে তোমার পদমূলে আঁকিতে আমি ধীরে নিরত হই,
উছলি আঁখি-ধার ঝরে যে বার বার, দৃষ্টি-পথ মোর করে যে রোধ ;
বিধাতা নিরমম, চিত্রে দু'জনার মিলন তাও সে যে করে বিরোধ। ৪৪।

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দ্দয়াশ্লেষহেতো-
র্লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি॥ ৪৫

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্ব্বস্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি॥ ৪৬

"স্বপনে কোনো দিন যদি বা, প্রিয়তমা, দরশ লভি তব, তখন হায়,
বিথারি' দিই আমি শূন্যে বাহু-যুগ' তোমারে বাঁধিবারে বাহু-কারায় ;
আমার দশা হেরি' কানন-দেবতার মুকুতা সম ঝরে নয়ন-জল
কত না ফোটা ফোঁটা তরুর কিশলয়ে—আমার প্রতি যেন কৃপা বিকল। ৪৫

"টুটিয়া দেবদারু- পত্রপুট যত, মাখিয়া রস-বাস অঙ্গময়
সুরভি বায়ু আসে দখিন-মুখে ছুটি' পরশি' হিমাচল তুষারালয় ;
হয়ত তোমারে সে পরশ করি' আসে, হে প্রিয়া, মনে মনে ভাবিয়া তাই
সকল অঙ্গেতে সে বায়ু মাখি' লয়ে পরশ তব যেন তাহাতে পাই। ৪৬।

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা
সর্বাবস্থাস্বহরপি কথং মন্দ মন্দাতপং স্যাৎ।
ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে দুর্লভ-প্রার্থনং মে
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগব্যথাভিঃ ॥ ৪৭

নন্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে
তৎ কল্যাণি ত্বমপি সুতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥ ৪৮

“চটুল-নয়না গো, দীর্ঘ রজনীরে কেমনে ছোট করি নিমেষ প্রায়,
সকল কালে আমি কেমনে দিবসেরে কাটাতে পারি নিঃ শীতলতায়,-
এ হেন দুর্লভ বাসনা পূরাবারে এ হিয়া দুরাশায় কাটায় দিন ;
তোমার বিচ্ছেদে গভীর সন্তাপে রহে যে জরজর উপায়হীন। ৪৭।

“শুন গো কল্যাণী, ভাবনা বহু সহি’ হৃদয় অবশেষে করি যে থির ;
কাতর হ’য়ো নাকো, দহন ভুলে থাকো, চিত্ত করো তব শান্ত ধীর।
কে বলো এ ধরায় নিয়ত সুখ পায়, কে বলো লভে সদা দুঃখদায় ?-
ভাগ্য অবিরত চক্রনেমি মত উপরে উঠে, পুন’ নিম্নে যায়। ৪৮।

শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গ পাণৌ
মাসানন্যান গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা ।
পশ্চাদাবং বিরহগুণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥

ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বনং বিপ্রবুদ্ধা ।
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি ॥ ৫

"ভুজগ শয্যায় ত্যজিয়া হৃষীকেশ উঠিবে যবে তবে কাটিবে শাপ ;
রহো এ চারি মাস হৃদয়ে বহি' আশ, নয়ন মুদে আর ভুলিয়া তাপ।
বিরহকালে, প্রিয়া, মোদের দুটি হিয়া করেছে অবিরাম যে-অভিলাষ,
শারদ-পূর্ণিমা- নিশায় দোঁহে মোরা পূরাব সব সাধ সকল আশ।" ৪৯

"অবলা, শুন-পুন", বলেছে স্বামী তব— "একদা নিশাকালে শয়নে মোর
কণ্ঠে ছিলে লীন, সহসা হেনকালে কাঁদিলে তুমি হ'তে ঘুমের ঘোর ;
কাঁদিলে কেন তুমি, যখন শুধানু তা, কহিলে মনে মনে হেসে মৃদুল—
'স্বপনে হেরি একি অপর কামিনীরে সোহাগ করো তুমি শঠ চটুল।' ৫০

এতস্মান্মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্বিদিত্বা
মা কৌলীনাদসিতনয়নে ময্যবিশ্বাসিনী ভূঃ।
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে হ্রাসিনস্তে হ্যভোগা-
দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি ॥ ৫১ ॥

আশ্বাস্যৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীং তে
শৈলাদাশু ত্রিনয়নবৃষোৎখাতকূটান্নিবৃত্তঃ।
সাভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদ্বচোভির্মমাপি
প্রাতঃকুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥ ৫২

"হে কালো-আঁখি প্রিয়া, এ গূঢ় পরিচয়ে জানিও বেঁচে আছি, মোর কুশল,
অশুভ নানা কথা ক'রো না প্রত্যয়, রাখিয়ো চিত্ত তব অচঞ্চল।
লোকে যে বলে—হায়, বিরহ-কালে সদা প্রণয় পায় হ্রাস, প্রীতির ক্ষয়;
অসার কথা এই—জানিও প্রিয়তমা, বিরহে ভালোবাসা অগাধ হয়।" ৫১।

ভ্রাতৃজায়া তব প্রথম-বিরহিণী, তাহারে প্রবোধিতে বলি' এ বাক্
ত্যজিয়া এস গিরি, শিবের বৃষ যেথা শৃঙ্গে খোঁড়ে সদা শিখর-ভাগ।
অভিজ্ঞান সহ, শুন হে বারিবাহ, কুশল-সমাচার প্রিয়া যা চায়,
বহিয়া এনো তাহা বাঁচাতে মন প্রাণ, শিথিল এ যে প্রাত'- কুন্দ প্রায়। ৫২

কচ্চিৎ সোম্য ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং তর্কয়ামি ।
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥ ৫৩ ॥

এতৎ কৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্তিনো মে
সৌহার্দাদ্বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা ।
ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী-
র্মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥ ৫৪ ॥

সৌম্য জলধর, রাখিয়া অনুরোধ ল'বে না বন্ধুর এ সংবাদ ?
মৌন হেরি' তোমা' বুঝেছি আমি, সখা, আছ যে অভিলাষী পুরাতে সাধ।
কথা না কহি' তুমি চাতকে বারি দাও যেমনি যাচে তারা তব আসার ;
সাধিয়া প্রিয়জন- করম সাধু জন দেন যে উত্তর প্রার্থনার। ৫৩।

বন্ধু-প্রীতি-ভরে অথবা মোর দুখে দুখিত হ'য়ে, মেঘ, হৃদয়-মাঝ,
যদিও হেন কাজ তোমারে সাজে নাকো, তথাপি ক'রো মোর এ প্রিয় কাজ
বরষা-সম্ভারে শোভন রূপ ধরি' ঘুরিও দেশে দেশে যেথায় চাও ;
বিজলী-বধূ সাথে ক্ষণেক যেন তব বিরহ নাহি ঘটে, দুখ না পাও। ৫৪।

শেষ
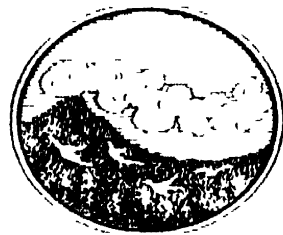
মেঘদূত-প্রসঙ্গ

অনুবাদ আর ব্যাখ্যা এক জিনিস নয়। অনুবাদ করিতে করিতে ব্যাখ্যার কাজ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব নয় এবং সম্ভব হইলেও সঙ্গত নয়। অথচ মেঘদূত প্রভৃতি প্রাচীন কাব্য বুঝিতে হইলে স্থানে স্থানে কাব্যোক্ত নানা প্রসঙ্গের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। এ স্থানে আমরা মেঘদূতের বিভিন্ন প্রসঙ্গের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। রামগিরি হইতে মেঘের অলকা-যাত্রার উপলক্ষ্যে কালিদাস তৎকালীন ভারতীয় নদী, পর্বত ও জনপদ সমূহের যে চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন তা মেঘদূতের একটি বিশেষত্ব। কাজেই মেঘদূতের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে মেঘদূতে উক্ত এই সমস্ত প্রাচীন জায়গার সংস্থান জানা বিশেষ প্রয়োজন। তাই এই "মেঘদূত প্রসঙ্গে" আমরা প্রথমতঃ শ্লোক-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন প্রসঙ্গের পরিচয় দিব ও তারপরে মেঘদূতে স্থানগুলির পরিচয় দিব। প্রত্যেক নাম বা বিশেষ শব্দের পর বন্ধনীর মধ্যে শ্লোক-সংখ্যা দেওয়া হইল।

মেঘদূত—মেঘকে দূত করিয়া পাঠাইবার কল্পনা কালিদাসের মনে কিরূপে আসিল সে-সম্বন্ধে বহুদিন ধরিয়াই আলোচনা চলিয়াছে। মল্লিনাথ বলেন যে, অনেকের মতে রাম

হনুমান্‌কে সীতার নিকট দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন—রামায়ণের এই আখ্যানটি মনে রাখিয়াই কালিদাস মেঘদূত রচনা করিয়াছিলেন। মল্লিনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী মেঘদূতের অন্যতম টীকাকার দক্ষিণাবর্ত্তও মেঘদূতের টীকার ভূমিকায় এই কথাই বলিয়াছেন। মেঘদূতেরই একটি উক্তি (ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা,—উত্তরমেঘ, ৩৯) হইতে এই মতকে সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। পক্ষান্তরে আধুনিক কালে পণ্ডিতেরা কালিদাসের পূর্ব্বেও এই রকম দূত কাব্যের সূচনা দেখিতে পাইয়াছেন। পালি সাহিত্যেও এই রকম দূত প্রেরণের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের চৈনিক কাব্য-সাহিত্যে কোনো বিরহিণীকর্ত্তৃক একটি মেঘকে প্রিয়তমের নিকট দূতরূপে প্রেরণের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। অনেকে কালিদাসের উপর এই চৈনিক কাব্যের প্রভাব আছে মনে করেন। কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছুই বলা যায় না।

পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ—অতি প্রাচীনকাল হইতেই কালিদাসের মেঘদূত শুধু 'মেঘ' নামেও পরিচিত হইয়া আসিতেছে। সেইজন্যেই মেঘদূতের পূর্ব্বাংশকে (প্রথম হইতে মেঘের অলকা যাওয়া পর্য্যন্ত) 'পূর্ব্বমেঘ' এবং উত্তরাংশকে 'উত্তরমেঘ' বলা হয়। কিন্তু কালিদাস নিজে এই কাব্যখানিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ নাম দিয়েছিলেন কি না সন্দেহের বিষয়।

পূর্ব্বমেঘ

যক্ষ (১)—এক শ্রেণীর দেবতা। যক্ষরা কৈলাসশিখরে অলকা নগরীতে ধনপতি কুবেরের অনুচর বলিয়া প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে নিয়ম আছে যে, কাব্যে অভিশপ্ত ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ করিতে নাই। তাই কালিদাস যক্ষের নাম না বলিয়া শুধু "কশ্চিদ্ যক্ষঃ" বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন।

কনক-বলয় (২)—তখনকার দিনে পুরুষেরাও সোনার অলঙ্কার পরিত।

বপ্রক্রীড়া (২)—বপ্র মানে উচ্চভূমি। হাতী, ষাঁড় প্রভৃতি দাঁত বা শিঙ্ দিয়া মাটি খুঁড়িয়া যে খেলা করে তাকে বলে বপ্র-ক্রীড়া।

কেতকাধানহেতোঃ (৩)—'কৌতুকাধানহেতোঃ' পাঠের চেয়ে 'কেতকাধানহেতোঃ' পাঠই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। বর্ষাকালে কেতকী বা কেয়া-ফুল ফোটে (পূর্ব্বমেঘ, ২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

কুটজ-কুসুম (৪)—কুর্চি ফুল। আষাঢ় মাসে ফোটে।

মেঘ (৪)—ধূম, জ্যোতি, জল এবং বায়ু, এই কয় পদার্থের সংযোগে মেঘের সৃষ্টি হয় বলিয়া তৎকালের লোকের ধারণা ছিল।

গুহ্যক (৫)—যক্ষ।

পুষ্করাবর্ত্তক (৬)—পুষ্কর ও আবর্ত্তক পুরাণ বিখ্যাত মেঘবিশেষের নাম।

তোয়গৃধ্নুঃ (৯)—প্রচলিত পাঠ "তে সগন্ধাঃ"। "তোয়গৃধ্নুঃ" পাঠ অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। চাতক-পক্ষী মেঘের জল পান করে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বলাকা (৯)—স্ত্রী-বক। বর্ষাকালেই বকপক্ষীদের গর্ভধারণের সময়। সেইজন্যই মেঘের সহিত এদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

শিলীন্ধ্র (১১)—ব্যাঙের ছাতা। বর্ষাকালেই হয়। ইহা জন্মাইলে পৃথিবী প্রচুর-শস্যশালিনী হয় বলিয়া জনবাদ ছিল।

রাজহংস (১১)—বর্ষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজহংসরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে মানস-সরোবরে চলিয়া যায় বলিয়া কবিপ্রসিদ্ধি ছিল। এই প্রসিদ্ধি একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

সিদ্ধ (১৪)—সিদ্ধও যক্ষের মত এক শ্রেণীর দেবতা। এঁরা পাহাড়ে থাকিয়া তপস্যা করিতেন, কিন্তু বিবাহও করিতেন। এঁদের পত্নীরা অতি সরল প্রকৃতির ছিলেন। এঁরা স্ত্রী-পুরুষে বীণা বাজাইয়া গান করিয়া বেড়াইতেন (৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

নিচুল ও দিঙ্‌নাগ (১৪)—নিচুল মানে বেতগাছ। আটটি হাতী পৃথিবীর আট দিক্ রক্ষা করে বলিয়া পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল। এই আটটি হাতীকে বলা হইত দিগ্‌গজ বা দিঙ্‌নাগ।

ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোঽঞ্জনঃ।
পুষ্পদন্তঃ সার্ব্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্‌গজাঃ॥—অমরকোষ

মল্লিনাথ বলেন যে, এই শ্লোকে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ ও কালিদাসের সহাধ্যায়ী মহাকবি নিচুল সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত রহিয়াছে। মল্লিনাথের মতে দিঙ্‌নাগ কালিদাসের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিলেন; সেইজন্যই এখানে "স্থূলহস্তাবলেপ" শব্দ ব্যবহারের দ্বারা দিঙ্‌নাগের প্রতি কালিদাসের বিরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এবং "সরস" শব্দের দ্বারা নিচুলের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা হইয়াছে। কালিদাসের টীকাকার দক্ষিণাবর্ত্তও (ইনি মল্লিনাথের পূর্ব্বগামী) এই শ্লোকে বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে করেন। মল্লিনাথের এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ কালিদাসের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্লোকে কোনো শ্লেষ বা দ্ব্যর্থবোধক ধ্বনি আছে বলিয়া মনে হয় না। মল্লিনাথের এই উক্তি ছাড়া নিচুল সম্বন্ধেও আর কিছুই জানা যায় না। মেঘদূতের প্রাচীনতম টীকাকার বল্লভদেব কিন্তু এই শ্লোকের টীকায় দিঙ্‌নাগাচার্য্য সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেন নাই। এই শ্লোকে

দিঙ্‌নাগাচার্য্যের প্রতি প্রচ্ছন্ন খোঁচা রহিয়াছে ধরিয়া লইলেও কালিদাসের কাল সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না। কারণ, দিঙ্‌নাগাচার্যকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করিবার কোনো হেতু নাই।

ইন্দ্রধনু (১২)—বল্মীক অর্থাৎ উইঢিবির ভিতরে অবস্থিত মহাসর্পের মাথার মণির কিরণ হইতে ইন্দ্রধনুর উৎপত্তি বলিয়া তৎকালে ধারণা ছিল।

যেন শ্যামং ··গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ (১৫)—বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে এই শ্লোকটি খুব মূল্যবান্। কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, তিনি বাল্য-কালে গোপবেশে থাকিতেন, মাথায় শিখিপুচ্ছ ধারণ করিতেন এবং তাঁর বর্ণ শ্যাম ছিল—এই সমস্ত ভাব কালিদাসের সময়েও বেশ প্রচলিত ছিল। আজকালও এই সব ধারণা সমান ভাবেই চলিতেছে।

ভক্তিচ্ছেদৈঃ ইত্যাদি (১৯)—হাতীর গায়ে শাদা শাদা রেখা আঁকিলে যেমন দেখায় বিন্ধ্যপর্ব্বতের গায়ে রেবা নদীর ক্ষীণ ধারাগুলিকেও তেমনই দেখায়।

কন্দলী (২১)—ভূমিচম্পক বা ভুঁইচাঁপা।

দগ্ধারণ্যেষু (২১)—প্রচলিত 'জম্বুারণ্যেষু' পাঠের চেয়ে এই পাঠই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়।

উক্ত শ্লোকের পর "আপ্তোবিন্দু গ্রহণ" ইত্যাদি একটি শ্লোককে মল্লিনাথ প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। বল্লভদেব এবং জিনসেনের ধৃত পাঠেও তা নাই। সুতরাং ঐ শ্লোকটি পরিত্যক্ত হইল।

গ্রাম-চৈত্য (২৩)—গ্রামের পথের উপর যে বড় বড় গাছ থাকে সেগুলিকে বলে গ্রাম-চৈত্য।

পণ্যস্ত্রী (২৫)—বেশ্যা বা গণিকা। প্রাচীন ভারতে যে পণ্যস্ত্রীদের প্রভাব খুবই ছিল মল্লনাগ-বাৎস্যায়নের কামসূত্রে তার প্রচুর নিদর্শন আছে।

পরিমল (২৫)—সুগন্ধ দ্রব্য মাত্রকেই পরিমল বলে না। চন্দনাদি যে সমস্ত সুগন্ধ দ্রব্য মর্দন করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিতে হয় তাকে বলে পরিমল। এই পরিমল দেহে লেপন করিত বলিয়া তার আর-এক নাম অনুলেপন (উত্তরমেঘ, ১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। মিলনকালে যে পরিমল বা অনুলেপন ব্যবহৃত হইত তাকেই এখানে রতিপরিমল বলা হইয়াছে (কামসূত্র, ১।৪।৮)।

'উদ্দামানি যৌবনানি' কথায় বোঝা যায় যে, বিদিশার নাগরদের নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার দরুণ কালিদাস বিদিশার উপর বিশেষ প্রীত ছিলেন না।

উজ্জয়িনী (২৭)— এই শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী আরও দশটি শ্লোকে (৩ -৩৯ কালিদাস

উজ্জয়িনীর বর্ণনা করিয়াছেন। সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে এগারটি শ্লোকই উজ্জয়িনীর উদ্দেশ্যে রচিত। তা ছাড়া উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের যেরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাতেও মনে হয়, উজ্জয়িনীর প্রতি কালিদাসের বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

উদয়নকথা (৩০)—চণ্ডপ্রদ্যোত মহাসেন ছিলেন অবন্তির রাজা। তাঁর পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিল, নাম বাসবদত্তা। বৎসদেশ বা কৌশাম্বীর (প্রয়াগের নিকটে বর্ত্তমান কোসাম) রাজা ছিলেন উদয়ন। ঘটনাচক্রে বাসবদত্তা ও উদয়নের মধ্যে প্রণয় হয় এবং উদয়ন অবন্তি-রাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বাসবদত্তাকে হরণ করিয়া লইয়া বিবাহ করেন। ইহাই উদয়ন-কথার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম। উদয়নের এই কাহিনী কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সাহিত্যের বহু স্থানেই পাওয়া যায়। মহাকবি ভাস (ইনি কালিদাসের পূর্ব্বগামী) এই গল্প অবলম্বন করিয়াই "প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ" নাটক রচনা করিয়াছিলেন। গুণাঢ্যের (খৃঃ ৬০০ এর পূর্ব্ববর্ত্তী) "বৃহৎকথা" নামক অধুনালুপ্ত বিখ্যাত গ্রন্থেও এই গল্প ছিল। এই বৃহৎকথা হইতেই উদয়নের গল্প পরবর্ত্তী কালে ক্ষেমেন্দ্রের "বৃহৎকথামঞ্জরী"তে (১০৩৭) এবং সোমদেবের "কথাসরিৎসাগরে" (১০৬০—৮১) স্থান পাইয়াছে। যা হোক, কালিদাসের সময়ে অবন্তির গ্রাম বৃদ্ধদের মধ্যে পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমেই এই গল্প চলিয়া আসিতেছিল ; গল্পটিও অবন্তিরই এক রাজকন্যা সম্বন্ধে।

তারা বৃহৎকথা হইতেই ঐ গল্প শিখিয়াছিল, এমন মনে করার কোনো কারণ নাই।

কেশসংস্কারধূম (৩২)—প্রচলিত পাঠে আছে 'ধূপ'। কিন্তু জালোদ্গীর্ণৈঃ এবং উপচিত-বপুঃ, এই দুইটি কথাতেই বোঝা যায় যে, ধূমই সঙ্গত পাঠ। মেয়েরা অগুরু প্রভৃতি গন্ধ-দ্রব্য পুড়াইয়া তার ধূমের দ্বারা কেশ সুবাসিত করিত।

নীত্বা রাত্রিং (৩২)—প্রচলিত পাঠে আছে "লক্ষ্মীং পশ্যন্"। কিন্তু লক্ষ্মীং পশ্যন্ পাঠে সঙ্গত অর্থই হয় না। অধ্যাপক কে, বি, পাঠকও মল্লিনাথের এই প্রচলিত পাঠ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

পাদরাগ (৩২)—আল্‌তা। মেয়েদের আল্‌তা পরার রীতি বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে।

গণ (৩৩)—প্রমথ, শিবের অনুচর।

চণ্ডেশ্বর (৩৩)—পরবর্ত্তী শ্লোকে উল্লিখিত মহাকাল; উভয় নামই শিবকে বুঝায়। উজ্জয়িনীর মহাকালের মন্দির কালিদাসের সময় হইতেই প্রসিদ্ধ। ঐ মন্দির গন্ধবতীর তীরে অবস্থিত ছিল। গজনীর বিখ্যাত সুলতান মাহ্‌মুদের (৯৯৭-১০৩০) সমকালীন মুসলমান পণ্ডিত আবু রৈহান অল্‌বেরুনীর ভারত-বিবরণেও এই মহাকালের উল্লেখ আছে [Sachau,

Vol I, p. 202 ; Elliot's History of India, Vol I, p. 59]। এখনও বহু যাত্রী মহাকালের মন্দিরে পূজা দিতে যায়।

সন্ধ্যাবলিপটহতাং (৩৫)—মহাকাল-মন্দিরের সান্ধ্য আরতি এখনও খুব প্রসিদ্ধ।

বেশ্যা (৩৫)—বেশ্যারা সান্ধ্যআরতির সময়ে মহাকালের মন্দিরে নৃত্য করিত। কালিদাসের সময়েও মন্দিরে দেবদাসী রাখার প্রথা ছিল।

নখপদ (৩৫)—নখচিহ্ন। তখনকার দিনে নাগরেরা বাম হাতের নখগুলিকে যত্নপূর্বক নানারকম করিয়া কাটিত এবং মিলনকালে প্রণয়িনীর দেহের নানাস্থানে ঐ সূক্ষ্মাগ্র নখের সাহায্যে বিচিত্র রকম রেখাপাত করিত। ইহাকে বলা হইত নখবিলেখন বা নখচ্ছেদ্য। প্রণয়-জ্ঞাপন ও প্রণয়-উদ্দীপনের উদ্দেশ্যে এই নখচ্ছেদ্য করা হইত (কামসূত্র, সাম্প্রয়োগিকাধিকরণ, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। মহাকাল মন্দিরের দেবদাসীদের দেহে প্রণয়ী-কৃত যে-সব নখক্ষত ছিল তাতে বৃষ্টি-বিন্দু পড়াতে তারা সুখ বোধ করিত অথবা তারা বৃষ্টিবিন্দুপাতেই নখবিলেখনের সুখ পাইত (উত্তরমেঘ, ৩৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

আর্দ্রনাগাজিনেচ্ছা (৩৫)—গজাসুরকে বধ করিয়া মহাদেব তার রক্তাক্ত চর্মখানা (অজিন) দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে, এই বীভৎস

কাণ্ড দেখিয়া ভবানী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। মেঘকে বলা হইতেছে, তুমি যদি সন্ধ্যার সময় লাল রঙ ধরিয়া নৃত্যপরায়ণ মহাদেবের হাত দুইটি ঘিরিয়া দাঁড়াও তবে মহাদেবের অজিন-সাধ মিটিবে এবং ভবানীর উদ্বেগও দূর হইবে।

খণ্ডিতা (৩৯)—প্রণয়ীকে অন্যাসক্ত দেখিয়া যে নায়িকা অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণ হয় তাকে খণ্ডিতা নায়িকা বলে।

পুষ্পমেঘ (৪২)—এক-প্রকার মেঘ পুষ্প বর্ষণ করে বলিয়া বিশ্বাস ছিল।

ব্যোমগঙ্গা (৪৩)—মন্দাকিনী ; গঙ্গা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে প্রবাহিত বলিয়া কল্পনা আছে। যে-গঙ্গা আকাশে প্রবাহিত তার নাম মন্দাকিনী।

হুতবহমুখে (৪৩)—মহাদেব নিজের তেজ অগ্নির মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন ; সেই অগ্নি হইতে কার্ত্তিকের জন্ম হয়—ইহাই পৌরাণিক কথা। দেবগিরিতে কার্ত্তিকের একটি মন্দির ছিল। তৎকালে কার্ত্তিকের পূজা আজকালের চেয়ে অনেক বেশী প্রচলিত ছিল। কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্ত-সম্রাটরাও কার্ত্তিকের ভক্ত ছিলেন।

পাবকি (৪৪) পাবক (অগ্নি) হইতে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কার্ত্তিকের এক নাম পাবকি।

শরবণভব (৪৫)—কার্ত্তিকের শরবণে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া আরেকটি প্রসিদ্ধি আছে।

তাই তাঁকে শরবণভব বলা হইয়াছে।

সুরভিতনয়ালম্ভ (৪৫)—সুরভিতনয়া=গোরু, আলম্ভ=যজ্ঞ। রন্তিদেব গোমেধ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে।

সিদ্ধ (৪৫)—পূর্বোক্ত সিদ্ধ (১৪) দ্রষ্টব্য।

শার্ঙ্গী (৪৬)—কৃষ্ণ; কৃষ্ণের বর্ণ কালো (শ্যাম) ছিল—সে কথা পূর্বোক্ত ১৫ শ্লোকেও বলা হইয়াছে।

গাণ্ডীবধন্বা (৪৮)—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জুনের খ্যাতির কথা কালিদাসের আমলেও খুব প্রসিদ্ধ ছিল।

লাঙ্গলী (৪৯)—হলধর, বলরাম। কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের প্রতিই তাঁর প্রীতি ছিল বলিয়া তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কোনো পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। বলরাম মদ্যপ ছিলেন। তিনি যে-মদ (হালা) পান করিতেন, তাঁর পত্নী রেবতী সাদরে সেই মদের পাত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতেন। সেইজন্যই ঐ মদকে রেবতীলোচনাঙ্ক বলা হইয়াছে। বলরাম পরে মদ ত্যাগ করিয়া সরস্বতীর জল পান করিয়াছিলেন।

সগরতনয় (৫০)—ভগীরথকর্তৃক সগরবংশ উদ্ধারের কাহিনী সুবিদিত। সগর রাজার

পুত্রগণ অশ্বমেধের ঘোড়ার সন্ধানে বাহির হইয়া কপিল মুনির তপস্যার ব্যাঘাত করায় কপিল তাহাদিগকে শাপ দিয়া ভস্মে পরিণত করেন। পরে সগরবংশের সন্তান ভগীরথ গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে অবতরণ করাইয়া সগরপুত্রগণের উদ্ধার করেন। এইজন্যই গঙ্গাকে 'সগরতনয়-স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তি' বলা হইয়াছে।

ভগীরথ যখন গঙ্গাকে পাতালের দিকে লইয়া যাইতেছিলেন তখন তপস্যারত জহ্নু মুনি গণ্ডূষ করিয়া সমস্ত গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলেন। পরে দয়াপরবশ হইয়া গঙ্গাকে নিজের ঊরু ভেদ করিয়া বাহির করিয়া দেন। তাই গঙ্গাকে জহ্নু-কন্যা বা জাহ্নবী বলা হয়।

গৌরীবক্ত্র ইত্যাদি (৫০)—স্বর্গ হইতে অবতরণ করার সময় গঙ্গা প্রথমত মহাদেবের জটায় অবতরণ করেন। সেইজন্য পার্ব্বতী বা গৌরী গঙ্গার উপর ঈর্ষান্বিত হন। কিন্তু গঙ্গা ঐ ঈর্ষাকে উপহাস করিয়াই মহাদেবের জটা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুরগজ (৫১)—ইন্দ্রের হাতী। এই হাতীর নাম ঐরাবত বা ঐরাবণ।

পূর্ব্বার্দ্ধলম্বী (৫১)—এই পাঠ সুস্পষ্ট কারণবশত "পশ্চার্দ্ধালম্বী" পাঠের চেয়ে অধিকতর সঙ্গত।

শরভ (৫৪)—অষ্টপদবিশিষ্ট কাল্পনিক মৃগ। ইহারা অতি কোপন প্রকৃতির বলিয়া

কল্পিত হয়।

সিদ্ধ (৫৫)—এখানে সিদ্ধ মানে যোগী, তপস্বী ; দেবতাবিশেষ নয়। এই শ্লোকের "চরণন্যাস" স্থানটি হরিদ্বারের নিকটবর্তী একটি তৎকাল-প্রসিদ্ধ তীর্থ ছিল বলিয়া মনে হয়।

কীচক (৫৬)—এক-প্রকার বাঁশ। তার ছিদ্রে বায়ু প্রবেশ করিলে বাঁশীর মত শব্দ হয়।

ত্রিপুরবিজয় (৫৬)—ত্রিপুরাসুরের তিন পুরী মহাদেব জয় করিয়াছিলেন বলিয়া পৌরাণিক কথা আছে।

কিন্নর (৫৬)—পুরাণোক্ত সঙ্গীতপ্রিয় জাতিবিশেষ ; দেবগায়ক।

বলি (৫৭)—এই শ্লোক হইতে বোঝা যায় যে, কালিদাসের সময়েই বিষ্ণুর বামন অবতারের কাহিনী বহু প্রচারিত হইয়াছিল। বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপের বিষয় পূর্বেই লক্ষ্য করা হইয়াছে (১৫ শ্লোক)। কালিদাসের সময়ে রামচন্দ্রও বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন (রামাভিধানো হরিঃ, রঘুবংশ, ১৩।১)।

দশমুখ ইত্যাদি (৫৮)—দশানন রাবণ একবার কৈলাস পর্বতকেই লঙ্কায় লইয়া যাইবার জন্য উহাকে তুলিবার চেষ্টা করিয়া অক্ষম হন ; কিন্তু তার ফলে কৈলাসের অনেক সন্ধিস্থল ভাঙিয়া যায়।

স্তম্ভিতান্তর্জল (৬০)—মেঘকে একটি জলভরা নরম গদির মত জিনিস বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

জনিতসলিল ইত্যাদি (৬১)—এই পাঠ প্রচলিত "বলয়কুলিশোদ্‌ঘট্টনোদ্‌গীর্ণতোয়ং" পাঠের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক ও সঙ্গত মনে হয়। হিমালয়ের নানা স্থানেই মেঘ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বৃষ্টিপাত করে, তাতে ঐ গৃহ সত্যসত্যই যন্ত্রধারাগৃহত্ব প্রাপ্ত হয়।

উত্তরমেঘ

লোধ্রপ্রসবরজঃ (২)—লোধ্র ফুলের রেণু। তখনকার দিনে মেয়েরা ফুলের রেণু বা পরাগ মুখে মাখিত, আধুনিক পাউডারের মত; দেহে অনুলেপন বা অঙ্গরাগ মাখিত আর পাদরাগ বা আলতা পরিত।

রতিফল (৫) —রতিফল নামক এক-প্রকার মদ (মধু)। এই মদ কল্পবৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হইত।

অন্বেষ্টব্যৈঃ ইত্যাদি (৮)—'গুপ্তমণি' নামক একরকম খেলা। একটি মেয়ে এক মুঠা মণি সোনার বালির ভিতর লুকাইয়া রাখিত, অন্যেরা তাই খুঁজিয়া বাহির করিত।

আলেখ্য (৮)—প্রাচীন ভারতের চিত্রবিদ্যার বহু পরিচয় সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়।

চন্দ্রকান্ত (৯)—মণিবিশেষ। চাঁদের কিরণ হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বৈভ্রাজ (১০)—অলকার উপকণ্ঠে একটি উপবনের নাম।

বারমুখ্যা (১০)—বারবনিতা ; অমরকোষের মতে দেবদাসী।

কল্পচ্ছেদৈঃ (১১)—কমলের পাপড়িগুলিতে পত্র-পুষ্পাদি নানা রকম চিত্র রচনা করা হইত। তাকেই ছেদ্য বলে।

মুক্তাজালগ্রস্তনপরিমলৈশ্ছিন্নসূত্রৈঃ (১১)—এই পাঠ 'মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈঃ' এই পাঠের চেয়ে অধিকতর সঙ্গত ও স্বাভাবিক। পরিমল মানে চন্দনপঙ্ক প্রভৃতি মর্দ্দন-জাত সুগন্ধ অনুলেপন (পূর্বমেঘ, ২৫ শ্লোক)। মেয়েরা স্তনেও উহা লেপন করিত। গতি-কম্পনে সুতা ছিঁড়িয়া যাওয়ায় পথে হারের মুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে এবং ঐ মুক্তায় স্তনের পরিমল লাগিয়া রহিয়াছে।

মধু (১৩)—মদ। তৎকালের বিলাসী মেয়েরা মদ পান করিত।

অশোক ও কেসর (১৭)—কেসর=বকুল। সুন্দরীদের বামপদ-তাড়নে অশোক গাছ এবং তাদের মুখের মদ্য-গণ্ডূষ-সেচনে বকুল গাছ কুসুমিত হয় বলিয়া কবি-প্রসিদ্ধি ছিল।

শঙ্খপদ্ম (১৯)—যক্ষের গৃহদ্বারের এক দিকে শঙ্খ ও অন্য দিকে পদ্ম আঁকা ছিল।

শ্যামা (২১)—তরুণী ; "যৌবন-মধ্যস্থা", তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা।

শিখরদশনা (২১)—তীক্ষ্ণদশনা। মুক্তার মত তীক্ষ্ণ দাঁত নারীদের সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। "সমাঃ স্নিগ্ধচ্ছায়া রাগ-গ্রাহিণো যুক্তপ্রমাণা নিশ্ছিদ্রাস্তীক্ষ্ণাগ্রা ইতি দশনগুণাঃ" (কামসূত্র, সাম্প্রয়োগিকাধিকরণ, ৫।২)। সুলক্ষণা নারীদের দন্ত, ওষ্ঠ, নাভি, শ্রোণী প্রভৃতির বর্ণনার জন্য বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা (৭০ অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।

চক্রবাকী (২২)—চক্রবাক চক্রবাকী (চখা-চখী) দিনের বেলায় একত্র থাকে এবং রাত্রিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। চক্রবাক-চক্রবাকীর একনিষ্ঠ দাম্পত্যপ্রীতি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ।

দেহলী (২৬)—চৌকাঠ। যক্ষ-প্রিয়া প্রত্যহ দ্বারের কাছে একটি করিয়া ফুল রাখিত এবং পরে ঐ ফুল গুনিয়া দেখিত, বিরহের কত দিন গেল আর কত দিন বাকি আছে।

একবেণী (৩১)—প্রোষিতভর্তৃকারা একবেণী ধারণ করিতেন, খোঁপা বাঁধিতেন না,

চোখে কাজল পরিতেন না, নখ কাটিতেন না, মদ্য পান করিতেন না এবং স্নানাদির সময় তেল ব্যবহার করিতেন না। বিরহের অবসানে ভর্ত্তা স্বহস্তে ঐ বেণী খুলিয়া দিতেন। এই বেণী-মোচনই বিরহাবসানের প্রথম ও প্রধান কাজ। পূর্ব্ববর্ত্তী (৩০) শ্লোক ও পরবর্ত্তী (৩৮) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পেলবং (৩২)—প্রচলিত 'পেশল' পাঠ মোটেই সঙ্গত নয়। অধ্যাপক কে, বি, পাঠকেরও এই মত।

কররুহপদ (৩৫)—নখরেখা। পূর্ব্বোক্ত 'নখপদ' (পূর্ব্বমেঘ, ৩৫) দ্রষ্টব্য।

বেণীমোক্ষ (৩৮)—পূর্ব্ববর্ত্তী 'একবেণী' (৩১) দ্রষ্টব্য।

পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা (৩৯)—এই উক্তি হইতে মনে হয় মেঘদূত রচনাকালে পবনতনয়ের এই দৌত্যের কথা কালিদাসের মনে ছিল।

ভীরু (৪৩)—প্রচলিত পাঠে আছে 'চণ্ডি'। চণ্ডি-র চেয়ে ভীরু কথা অনেক সঙ্গত।

ধাতুরাগ (৪৮)—গৈরিকাদি রঞ্জনদ্রব্য। অন্য রঙের অভাবে যক্ষ ইহাই ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

শাপান্ত ইত্যাদি (৪৯) –শার্ঙ্গপাণি (নারায়ণ) যে দিন অনন্তশয্যা ত্যাগ করিয়া

উঠিবেন সে-দিন যক্ষের শাপের অবসান হইবে। নারায়ণ আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী তিথিতে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন; কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশীতে উত্থান করেন। সুতরাং উত্থান-একাদশী বা কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী যক্ষের শাপাবসানের তিথি।

শরচ্চন্দ্রিকাসু (৫৯)—তৎকালে কার্ত্তিক মাসকে শরৎকাল বলিয়া ধরা হইত। সে-সময়ে চান্দ্র মাস প্রচলিত ছিল।

দেশ-পরিচয়

রামগিরি (১)—বল্লভদেব ও মল্লিনাথ উভয়েই রামগিরিকে রামায়ণের চিত্রকূট পর্ব্বত (প্রয়াগের নিকটে) হইতে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। চিত্রকূট পর্ব্বত এখনও চিত্রকূট নামেই পরিচিত। ইহা প্রয়াগের দক্ষিণে কেন্ (প্রাচীন শুক্তিমতী) ও টন্‌স্ (প্রাচীন তমসা) এই দুইটি নদীর মধ্যে পান্না নামক স্থানের নিকটে অবস্থিত। ইহার পার্শ্বেই চিত্রকূটা (বর্ত্তমান পৈস্বনী) নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই পর্ব্বতের নিকটেই আধুনিক চিত্রকূট রেলওয়ে ষ্টেশন অবস্থিত। আধুনিক বাস্তার রাজ্যের প্রধান শহর জগদ্দলপুরের নিকটে ইন্দ্রবতী নদীর তীরে অবস্থিত চিত্রকূট নামে আর একটি স্থান আছে। কিন্তু কোনো চিত্রকূটই রামগিরি হইতে

পারে না। কারণ, প্রথম চিত্রকূট রেবা বা নর্ম্মদা নদীর উত্তরে অবস্থিত, দক্ষিণে নয়। আর দ্বিতীয় চিত্রকূট নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তিস্থল হইতেও দূরবর্ত্তী এবং এখানে কোনো পর্ব্বত নাই।

কেহ কেহ রামগিরিকে মধ্যভারতের সরগুজা রাজ্যের অন্তর্গত রামগড় পাহাড় বলিয়া মনে করেন। অনেকে রামগিরিকে বর্ত্তমান নাগপুরের কিছু উত্তরে অবস্থিত রামটেক্ নামক স্থানের সহিত অভিন্ন মনে করেন। এই শেষোক্ত মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়; কারণ তাতে মেঘের গতিপথের সহিত সঙ্গতি থাকে। মেঘকে রামগিরি হইতে উত্তর দিকে (উদঙ্মুখঃ) যাইতে বলা হইয়াছে। রেবা বা নর্ম্মদা চিত্রকূট হইতে দক্ষিণ দিকে এবং সরগুজার অন্তর্গত রামগড় হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। সুতরাং চিত্রকূট বা রামগড় রামগিরি হইতে পারে না। কিন্তু রামটেক হইতে রেবা উত্তর দিকেই অবস্থিত।

মালক্ষেত্র (১৬)—কোনো কোনো পণ্ডিত এস্থলে মাল নামক কোন বিশেষ স্থান বুঝাইতেছে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু 'সদ্যঃসীরোৎকষণসুরভি' এই বিশেষণের দ্বারাই বোঝা যায় এখানে সাধারণ মালভূমিকেই বুঝাইতেছে। আবার কেহ কেহ মনে করেন, মালক্ষেত্র দ্বারা মালবদেশকে বুঝাইতেছে। কিন্তু মালব নামের সহিত মালভূমির কোনো যোগ নাই; মালব জাতির বাসভূমি বলিয়া ঐ দেশের নাম হইয়াছে মালব। আর এই মালক্ষেত্র রেবা

নদীর দক্ষিণে এবং আম্রকূট পাহাড়েরও আসন্ন দক্ষিণে অবস্থিত। মালবদেশ বিন্ধ্যপর্ব্বতেরও উত্তর দিকে ; সুতরাং এই মালক্ষেত্রের সঙ্গে মালবদেশের কোনো সম্বন্ধ নাই।

আম্রকূট (১৭)—অনেকেই ইহাকে বিলাসপুর ও বম্বপুর শহরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত অমরকণ্টক নামক পর্ব্বত-শৃঙ্গের সহিত অভিন্ন মনে করেন। অমরকণ্টক মৈকল গিরিমালার একটি শৃঙ্গ ; ইহার নিকটেই শোণ, মহানদী ও নর্ম্মদার উৎপত্তি হইয়াছে। নাম-সাদৃশ্য এবং নর্ম্মদার সান্নিধ্য ছাড়া আম্রকূট ও অমরকণ্টককে এক মনে করার কোনো হেতু নাই। আম্রকূট রামগিরি হইতে উত্তরে, একথা মেঘদূতেই আছে ; অথচ অমরকণ্টক চিত্রকূট, রামগড় বা রামটেক্ কোনো স্থান হইতেই উত্তরে নয়,—রামগড় হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। সুতরাং অমরকণ্টককে আম্রকূট মনে করা যাইতে পারে না। রামটেক্ যদি রামগিরি হয় তবে আম্রকূট বর্ত্তমান রামটেকের উত্তরে এবং নর্ম্মদার দক্ষিণে কোনো পর্ব্বত হইবে, একথা বলা যায়।

রেবা (১৯)—সুপ্রসিদ্ধ নর্ম্মদা নদীরই অপর নাম রেবা। এই নদী অমরকণ্টক পর্ব্বতের নিকটে উৎপন্ন হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভৃগুকচ্ছ (বর্ত্তমান ব্রোচ্) নগরের নিকটে পশ্চিম সাগরে (বর্ত্তমান আরবসাগরে) পতিত হইয়াছে।

বিন্ধ্য (১৯)—বর্ত্তমান বিন্ধ্যপর্ব্বত ও প্রাচীন বিন্ধ্যগিরি সম্পূর্ণ এক নয়। মধ্যভারতের

ভিতর দিয়া যে পর্ব্বত-শ্রেণী এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে আজকাল তাকেই বিন্ধ্য পর্ব্বত বলা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান ভোপাল এবং ভিল্‌সার নিকট হইতে এই পর্ব্বত-শ্রেণীর পূর্ব্বাংশ মাত্র পুরাকালে বিন্ধ্য নামে পরিচিত ছিল এবং পশ্চিমাংশকে পারিযাত্র বা পারিপাত্র বলা হইত। বর্ত্তমান আরাবল্লী পর্ব্বতকেও সম্ভবতঃ তখন পারিযাত্রের অন্তর্গত বলিয়াই গণ্য করা হইত। তৎকালখ্যাত সাতটি কুলাচলের মধ্যে বিন্ধ্য ও পারিযাত্র দুইটি।

মহেন্দ্রমলয়সহ্যাঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ॥

তবে কখনও কখনও বৃহত্তর অর্থে বিন্ধ্য ও পারিযাত্র এই দুইটিকে একত্রে বিন্ধ্য বলা হইত, একথাও মনে রাখা উচিত।

দশার্ণ (২৩)—বর্ত্তমান মালবের পূর্ব্বাংশেরই প্রাচীন নাম দশার্ণ। বেত্রবতী (আধুনিক বেতোয়া) ও শুক্তিমতী (আধুনিক কেন্), এই দুইটি নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে আর-একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে ; তার প্রাচীন নাম দশার্ণা, আধুনিক নাম দসান। বেত্রবতী ও শুক্তিমতী এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী এবং দশার্ণা নদীর উভয় পার্শ্ববর্তী দেশেরই প্রাচীন নাম দশার্ণ। মহাভারতে ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে এই দশার্ণের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিদিশা (২৪)—বিদিশা দশার্ণদেশের রাজধানী। প্রাচীন বিদিশা-নগরীর বর্ত্তমান নাম বেস্-নগর ; এই বেস্নগর বর্ত্তমান ভোপাল রাজ্যের অন্তর্গত ভিল্সা নামক স্থানের নিকটেই অবস্থিত। যে বিদিশা নগরী এক সময়ে দশার্ণের রাজধানী ছিল, এখন সে বিদিশা অজ্ঞাত-অখ্যাত সামান্য একটি পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। বৈম্বিক বা শুঙ্গবংশীয় রাজাদের আমলে বিদিশা উত্তর ভারতে দ্বিতীয় রাজধানীরূপে গণ্য হইত। শুঙ্গ-সম্রাট্ পুষ্যমিত্র যখন পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিতেছিলেন তখন তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্র বিদিশার শাসনকর্তা ছিলেন ; কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক হইতেই এই কথা জানা যায়। শুঙ্গ রাজাদের পর বিদিশার গৌরবের কথা বিশেষ শোনা যায় না। বিদিশা নামে একটি নদীও আছে, তার বর্ত্তমান নাম বেস্ ; উহা বেস্ নগরের নিকটেই বেত্তেয়া বা বেত্রবতীতে পড়িতেছে।

বেত্রবতী (২৪)—বর্ত্তমান বেতোয়া। এই নদী পারিযাত্র পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া যমুনায় পতিত হইতেছে। বেত্রবতী ও বিদিশা নদীর সঙ্গম-স্থলেই প্রাচীন বিদিশানগরী অবস্থিত ছিল।

নীচৈঃ (২৫)—বিদিশার নিকটবর্ত্তী একটি ছোট পাহাড়। অনুচ্চ বলিয়াই সম্ভবত এর "নীচৈঃ" নাম হইয়াছিল। আম্রকূট পর্ব্বতটি উচ্চ ছিল বলিয়া তাকে "উচ্চৈঃ" বলা হইয়াছে। নীচৈঃ পাহাড়ের আধুনিক নাম কি, তা ঠিক করিয়া বলা যায় না। কেহ কেহ বিখ্যাত সাঞ্চি

পাহাড়কেই এই নীচৈঃ পাহাড় বলিয়া মনে করেন ; সাঞ্চি বেস্ নগর হইতে কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। কালিদাস কিন্তু "তত্র" শব্দ ব্যবহার করিয়া জানাইতেছেন যে, এই নীচৈঃ পাহাড় বিদিশা নগরীর অংশ বলিয়াই গণ্য হইত। এই নীচৈঃ পাহাড়েই বিদিশার পণ্যস্ত্রীদের আলয় স্থাপিত ছিল। সুতরাং নীচৈঃ গিরি বিদিশা হইতে দূরে হইতে পারে না। প্রাচীন পালি সাহিত্যে বেদিসগিরি বলিয়া যে গিরির উল্লেখ আছে, সে বেদিসগিরি এবং এই নীচৈঃ গিরি একই হওয়া বিচিত্র নয়। এই বেদসগিরিবাসিনী কোনো শ্রেষ্ঠী রমণীর সহিত অশোকের সম্বন্ধের কথা পালি সাহিত্য হইতে জানা যায়।

বননদী (২৬)—নীচৈঃ পাহাড়ের পরেই বননদীর উল্লেখ করা হইয়াছে। বল্লভদেব ও মল্লিনাথ উভয়েই 'বননদী' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উইল্‌সন্ 'বননদী' না পড়িয়া 'নগনদী' পাঠই অধিকতর সঙ্গত মনে করেন এবং নগ অর্থাৎ পর্ব্বত হইতে জাত নদী, এই অর্থ করিয়া উহাকে বর্ত্তমান পার্ব্বতী নদী হইতে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু পার্জ্জিটার সাহেবের মতো পার্ব্বতী নদীর প্রাচীন নাম পারা। এই পারা বা পার্ব্বতী পরিযাত্র গিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া চর্ম্মণ্বতী (আধুনিক চম্বল) নদীতে পড়িয়াছে। অধ্যাপক কে, বি, পাঠকের মতে বননদী কোনো নদী বিশেষের নাম, আরণ্য নদী নয়। এই মত সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়।

উজ্জয়িনী (২৭)—পরবর্তী বিশালা (৩০) দ্রষ্টব্য।

নির্বিন্ধ্যা (২৮)—বায়ু-পুরাণে এই নদীর নাম দেওয়া হইয়াছে নির্বিন্ধ্যা। মল্লিনাথের মতে এই নদী বিন্ধ্যগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহাকে ঋক্ষ পর্বত হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণের এই উক্তি সম্ভবত ঠিক্ নয়; কারণ, মেঘদূতে নির্বিন্ধ্যাকে বেত্রবতী ও শিপ্রা নদীর মধ্যে স্থাপিত করা হইয়াছে। বেত্রবতী, বিদিশা, পারা বা পার্বতী এবং শিপ্রা, এই চারটি নদীই পারিযাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং বেত্রবতী ও শিপ্রার মধ্যবর্ত্তী নির্বিন্ধ্যার উৎপত্তিও পারিযাত্র পর্বতেই, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব মল্লিনাথের উক্তিও ঠিক্ নয়; বিন্ধ্য বলিতে যদি বৃহত্তর অর্থে বিন্ধ্য ও পারিযাত্র উভয় পর্বতকেই ধরিয়া লওয়া যায় তবে মল্লিনাথের উক্তি সমর্থন করা যায়।

নির্বিন্ধ্যা নদীর আধুনিক নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। পার্জ্জিটার সাহেব মনে করেন যে, পার্বতী ও কালীসিন্ধু এই নদীদ্বয়ের মধ্যস্থলে প্রবাহিত বর্তমান পারোয়ান নদীরই প্রাচীন নাম নির্বিন্ধ্যা। পার্জ্জিটার সাহেব পার্বতী নদীর পশ্চিমে প্রবাহিত পারোয়ান নদীকেই প্রাচীন নির্বিন্ধ্যা বলিয়া মনে করেন। মতান্তরে নির্বিন্ধ্যার আধুনিক নাম নিবাঝ। এই নিবাঝ নামটি

নির্ব্বিন্ধ্যা নামেরই রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। বিদিশা হইতে উজ্জয়িনী যাওয়ার পথে এখনও এই নিবাঝ নদী পার হইয়া যাইতে হয়। এইসব কারণে নিবাঝকেই প্রাচীন নির্ব্বিন্ধ্যার সহিত অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। নিবাঝ পারিযাত্র পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া কালীসিন্ধু নদীতে পড়িতেছে।

সিন্ধু (২৯)—এই সিন্ধু কোন্ নদী, এ সম্বন্ধে মল্লিনাথের সময় হইতেই সংশয় চলিয়া আসিতেছে। এই শ্লোকের পাঠ সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে, একথাও মল্লিনাথ জানিতেন। এই নদীর পরিচয় সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, "তামতীতস্য" এই পাঠ ধরিয়া কেহ কেহ এই সিন্ধুকে নির্ব্বিন্ধ্যা হইতে স্বতন্ত্র নদী মনে করেন। কিন্তু এই মত অগ্রাহ্য; কারণ, কাশ্মীর দেশে সিন্ধু নামে একটি নদ আছে বটে, কিন্তু সিন্ধু নামে কোনো নদী তো কোথাও নাই। অথচ সিন্ধু কথার একটি সাধারণ অর্থ নদী। এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া মল্লিনাথ এই সিন্ধুনদীকে পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিন্ধ্যা হইতে অভিন্ন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন—"অসৌ পূর্ব্বোক্তা সিন্ধুর্নদী নির্ব্বিন্ধ্যা"। কিন্তু মল্লিনাথের প্রদর্শিত যুক্তিগুলির কোন ভিত্তি নাই; কারণ কাশ্মীর (এবং পাঞ্জাবের) সুপরিচিত সিন্ধু নদ ছাড়াও মধ্যভারতে তিনটি সিন্ধু 'নদী' আছে, একথা মল্লিনাথ জানিতেন না। আর বল্লভদেব "তামতীতস্য সিন্ধুং" এই পাঠ ধরিয়া এই সিন্ধুকে নির্ব্বিন্ধ্যা বলিয়াই মনে করিয়াছেন।

আসল কথা এই যে, মল্লিনাথের যুক্তি ভিত্তিহীন হইলেও তাঁর সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে অর্থাৎ এই শ্লোকের সিন্ধু পূর্ব্ব শ্লোকের নির্ব্বিন্ধ্যা হইতে স্বতন্ত্র নদী নাও হইতে পারে। কারণ, পরবর্ত্তী পঁয়তাল্লিশ-সংখ্যক শ্লোকে কালিদাস চম্মণ্বতীর উল্লেখ করিয়া তার পরের শ্লোকেই "তস্যাঃ সিন্ধোঃ" বলিয়া পূর্ব্বোক্ত চম্মণ্বতীকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানেও ঠিক্ তেমনি "তাং সিন্ধুং" বা "অসৌ সিন্ধুঃ" পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিন্ধ্যাকেই বুঝাইতে পারে। উইল্সন্-প্রমুখ অনেকেই এই সিন্ধুকে নির্ব্বিন্ধ্যা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ধরিয়াছেন। যদি তাঁদের এই অনুমান সত্য হয় তবে এই সিন্ধু আর বর্ত্তমান কালীসিন্ধু সম্ভবত' একই নদী। কালীসিন্ধু পরিযাত্র পর্ব্বত হইতে চম্মণ্বতী বা চম্বলে পড়িয়াছে। মহাভারতের বনপর্ব্বে এই কালীসিন্ধুকেই দক্ষিণ-সিন্ধু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে আছে যে, অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র পিতামহ পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধের ঘোড়া লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া সিন্ধু নদীর তীরে যবনদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন; এই সিন্ধু নদী কালীসিন্ধু হইতে পারে, অথবা মধ্যভারতেরই অন্তর্গত যমুনার শাখা সিন্ধুও হইতে পারে। যমুনার শাখা এই সিন্ধুকে কোনো কোনো পুরাণে পূর্ব্বসিন্ধু বলা হইয়াছে। এই নদী প্রাচীন বিদিশার উত্তরে অবস্থিত সিরোঞ্জ নামক স্থানে উৎপন্ন হইয়া যমুনায় পড়িয়াছে এবং বিদিশা হইতে উজ্জয়িনী

যাওয়ার পথে পড়ে না ; সুতরাং মেঘদূতের সিন্ধু এই পূর্ব্বসিন্ধু হইতে পারে না। পক্ষান্তরে বিদিশা হইতে উজ্জয়িনী যাইতে এখনও কালীসিন্ধু পার হইয়া যাইতে হয় ; সুতরাং ইহাই মেঘদূতের সিন্ধু হওয়া সম্ভব। মধ্যভারতে 'ছোট সিন্ধু' নামে আর-একটি সিন্ধু আছে, উহাও চম্বলের শাখা ; এই 'ছোট সিন্ধু'র বিশেষ খ্যাতি নাই।

আজকাল রেল লাইনে বেস্‌-নগর হইতে উজ্জয়িনী যাইতে যে-পথে যাইতে হয় মেঘদূতের মেঘও প্রায় সেই পথেই বিদিশা হইতে উজ্জয়িনী গিয়াছিল। রেলপথে যাইতে আজকাল এই দুই স্থানের মধ্যে পার্ব্বতী, নিবাসা ও কালীসিন্ধু এই তিনটি বড় নদীর উপর দিয়া যাইতে হয়। এই তিনটি নদী যথাক্রমে মেঘদূতের বননদী (বা নগনদী), নির্ব্বিন্ধ্যা ও সিন্ধু হওয়া বিচিত্র নয়। সব বিষয় বিবেচনা করিলে এই শ্লোকের সিন্ধুকে কালীসিন্ধু বলিয়া মনে করাই সঙ্গত এবং জিনসেনের "তামতীতস্থ সিন্ধুঃ" এই পাঠই সমীচীন বোধ হয়।

অবন্তি (৩০)—বর্ত্তমান মালবের পশ্চিমাংশের প্রাচীন নাম ছিল অবন্তি। পূর্ব্বাংশের নাম দশার্ণ বা আকর। মেঘদূতের বর্ণনা হইতে মনে হয়, কালিদাসের যুগে নির্ব্বিন্ধ্যা কিংবা কালীসিন্ধু নদীই অবন্তিদেশের স্বাভাবিক পূর্ব্বসীমা ছিল। অবন্তি একটি বহু প্রাচীন জনপদ। বুদ্ধদেবের সময়ে অবন্তি একটি শক্তিশালী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য হইত ; সে-সময়ে অবন্তির

রাজা ছিলেন সুবিখ্যাত চণ্ডপ্রদ্যোত মহাসেন। বৎসরাজ উদয়ন ইঁহারই কন্যা বাসবদত্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বিশালাপুরী (৩০)—বিশালা উজ্জয়িনীরই নামান্তর। ইহা অবন্তি জনপদের রাজধানী ছিল। উজ্জয়িনীর আরও তিনটি নাম ছিল—পদ্মাবতী, ভোগবতী ও হিরণ্যবতী। বল্লভদেবের মতে বহু শালা বা গৃহ ছিল বলিয়াই উজ্জয়িনীর বিশালা নাম হইয়াছিল। গুপ্ত রাজবংশের পূর্বে শক-ক্ষত্রপগণ বহুকাল উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য শকদিগকে পরাজিত করিয়া উজ্জয়িনী অধিকার করেন। সে সময় হইতেই উজ্জয়িনী গুপ্তসাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত হয়। কালিদাস উজ্জয়িনীকে স্বর্গের একটি উজ্জ্বল খণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; ইহাতেই বোঝা যায়, উজ্জয়িনীর প্রতি কালিদাসের বিশেষ মমতা ছিল। উজ্জয়িনী এখন একটি অতি সামান্য শহরে পরিণত হইয়াছে।

শিপ্রা (৩১)—এই নদী এখনও শিপ্রা নামেই পরিচিত আছে। ইহা পরিযাত্র পর্বত হইতে চর্মণ্বতী বা চম্বলে পড়িয়াছে। এই শিপ্রা নদীর উপরেই উজ্জয়িনী অবস্থিত।

গন্ধবতী (৩৩)—ইহা শিপ্রা নদীর একটি ক্ষুদ্র শাখা। উজ্জয়িনীর নিকটেই শিপ্রায় পড়িয়াছে। ইহার তীরেই উজ্জয়িনীর সুবিখ্যাত চণ্ডেশ্বর বা মহাকালের মন্দির অবস্থিত ছিল।

ইহার বর্ত্তমান নাম গম্ভনালা।

গম্ভীরা (৪০)—ইহা শিপ্রা নদীর আর একটি শাখা। উজ্জয়িনী হইতে কিছু দূরে শিপ্রায় পড়িয়াছে।

দেবগিরি (৪২)—আধুনিক দেবগড়। এই ছোট পাহাড়টি উজ্জয়িনী হইতে দশপুর (বর্ত্তমান মন্দশোর) যাওয়ার পথে চম্বল নদীর দক্ষিণে অবস্থিত। কালিদাসের বর্ণনায় মনে হয়, তৎকালে এই গিরির উপরে স্কন্দ বা কার্ত্তিকের মন্দির ছিল। এখনও দেবগড়ে একটি কার্ত্তিকের মন্দির আছে।

চর্ম্মণ্বতী (৪৫)—বর্ত্তমান চম্বল। পারিযাত্র পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া যমুনায় পড়িয়াছে। কালিদাস কিন্তু মেঘদূতে নাম ধরিয়া এই নদীটির উল্লেখ করেন নাই। তিনি শুধু "রন্তিদেবের স্রোতোমূর্ত্তি কীর্ত্তি" বলিয়াই এই নদীটিকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাভারতে (দ্রোণ, ৬৫ অধ্যায় ; শান্তি, ২৯ অধ্যায়) কথিত আছে যে পুরাকালে রন্তিদেব নামে এক রাজা ছিলেন ; তিনি বহু গোরু নিহত করিয়া যজ্ঞ করিতেন ও ঐ মাংস দিয়া অতিথি সৎকার করিতেন। এই উপলক্ষে এত গোরু নিহত হইত যে, তাদের স্তূপীকৃত চর্ম্মের রস হইতে একটি বৃহৎ নদীর সৃষ্টি হয়। চর্ম্মরস হইতে উৎপন্ন বলিয়া নদীর নাম হইল চর্ম্মণ্বতী।

মহাভারতে কিন্তু রন্তিদেবকে দশপুরের রাজা বলা হয় নাই। প্রসঙ্গটির ভাবে বোধ হয়, চর্ম্মণ্বতীর উৎপত্তি-স্থলেই রন্তিদেবের রাজধানী ছিল বলাই মহাভারতকারের অভিপ্রায়। দশপুর চর্ম্মণ্বতীর উৎপত্তি-স্থলে তো নয়ই, উহার তীরবর্ত্তীও নয়। তথাপি মল্লিনাথ কী প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া রন্তিদেবকে দশপুরপতি বলিয়াছেন বোঝা গেল না। বল্লভদেবও রন্তিদেবকে দশপুরের রাজা বলেন নাই।

সিন্ধু (৪৬)—এখানে সিন্ধু স্পষ্টই চর্ম্মণ্বতীকেই বুঝাইতেছে। সিন্ধু কথার একটি সাধারণ অর্থ নদী।

দশপুর (৪৭)—একশো বছরের উপর হইল, মল্লিনাথের টীকায় রন্তিদেবকে দশপুরপতি বলা হইয়াছে দেখিয়া উইল্‌সন্ সাহেব রিন্তিমপুর নামক স্থানকে দশপুর বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। জায়গাটির নাম রিন্তিমপুর নয়; উহার প্রকৃত নাম রণথাম্ভোর—আলাউদ্দীন খিলজি ও আকবরের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই নামটি সম্ভবত' রণস্তম্ভপুর শব্দের বিকৃত রূপ। রন্তিদেবের সহিত উহার কোনো সম্বন্ধই নাই। অথচ উইল্‌সনের রিন্তিমপুরের উপর নির্ভর করিয়া পরে উহাকে একেবারে রন্তিপুর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রন্তিপুর নামে ভারতবর্ষে কোনো জায়গা আছে বলিয়া জানি না। দশপুরের বর্ত্তমান নাম দশোর; মানচিত্রে যে-

শহরটি মন্দশোর বলিয়া লেখা থাকে উহাই দশোর বা প্রাচীন দশপুর। (দশোরের নাম কেন মন্দশোর হইল সে-বিষয়ে **Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III by F. J. Fleet, p. 79, footnote** দ্রষ্টব্য)। মন্দশোর সিন্ধিয়া রাজ্যের মন্দশোর জেলার প্রধান শহর। চম্বলের শাখা শিবনা নদীর উত্তর অর্থাৎ বাম তীরে অবস্থিত। এখনও স্থানীয় লোকেরা উহাকে দশোরই বলিয়া থাকে। উজ্জয়িনী হইতে দশপুর প্রায় আশি মাইল উত্তর-পশ্চিমে। আজকাল এই দুইটি প্রাচীন স্থান রেলপথের দ্বারা যুক্ত হইয়াছে।

দশপুর প্রাচীন কালে খুব প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় (১৪।১২) এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৫৮।২২) দশপুরের উল্লেখ আছে। নাসিকে প্রাপ্ত একটি খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে শকরাজ নহপানের সময় (খৃঃ ১১৯-২৪) দশপুর একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। আর গুপ্তযুগে অর্থাৎ কালিদাসের সময়েও দশপুর খুবই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল তা বৎসভট্টি রচিত মন্দশোর-প্রশস্তি হইতেই বোঝা যায়। এই প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে, গুপ্তসম্রাট্ কুমারগুপ্তের আমলে (৪১৫-৪৫৫) বিশ্ববর্ম্মা দশপুরের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। বিশ্ববর্ম্মার পর তৎপুত্র বন্ধুবর্ম্মা দশপুরের শাসন-কর্ত্তা হন এবং তাঁরই আমলে ৪৩৭ খৃষ্টাব্দে একদল পট্টবায় নিজেদের শিল্পজাত অর্থে সকলে মিলিয়া দশপুরে একটি খুব সুন্দর

সূর্য্যের মন্দির নির্ম্মাণ করে (ভানমতুলং কারিতং দীপ্তরশ্মেঃ)। যাহোক, এই প্রশস্তি ও অন্যান্য কয়েকটি প্রাচীন লিপি হইতে অনুমান করা যায় যে, কালিদাস যদি চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৮০-৪১৪) ও কুমারগুপ্তের (৪১৫-৪৫৫) সমকালীন হন, তবে তিনি যখন মেঘদূতে দশপুরের বর্ণনা লিখিতেছিলেন সে-সময়ে এই বিশ্ববর্ম্মার (৪২৪-২৫) পিতা নরবর্ম্মা (৪০৫-৪০৬) কিংবা তাঁর পিতামহ সিংহবর্ম্মা মন্দশোর শাসন করিতেছিলেন। দশপুরের তৎকালীন প্রসিদ্ধির আর-একটি প্রমাণ এই যে, ঐ স্থানে আজ পর্য্যন্ত অন্তত পাঁচখানা বিশেষ মূল্যবান্ প্রাচীন লেখ পাওয়া গিয়াছে এবং এই সবগুলিই গুপ্তযুগের। দশপুর নাম হইতে মনে হয় দশটি স্বতন্ত্র পুর বা স্থান লইয়া দশপুরের পত্তন হয়।

ব্রহ্মাবর্ত্ত (৩৮)—সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুইটি অতি প্রাচীন ও পবিত্র নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশ।

সরস্বতী-দৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যো র্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ (মনুসংহিতা, ২।১৭)

এই ব্রহ্মাবর্ত্তই ভারতীয় বৈদিক সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র এবং মনুও বলিয়াছেন যে, এই স্থানে পারম্পর্য্য-ক্রমে যে-আচার চলে তাই সদাচার। ঋগ্বেদের যুগে সরস্বতী একটি খুব বড় নদী ছিল

বলিয়া মনে হয় এবং সে-সময়ে ইহার প্রসিদ্ধিও ছিল খুব বেশী। ঋগ্বেদের সুবিখ্যাত ভরত রাজারা ইহারই তীরে বাস করিতেন এবং সে-যুগের অনেক বড় বড় ঘটনাও ইহারই তীরে ঘটিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে এই নদী ক্ষীণ হইতে থাকে এবং ইহার ধারা বর্তমান রাজপুতানার মরুভূমিতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। যে-স্থানে সরস্বতীর ধারা মরুভূমিতে অন্তর্হিত হইয়াছে সে-স্থানের প্রাচীন নাম বিনশন (মনু, ২।২১)। প্রাচীন পৃথূদক (বর্তমান পেহোয়া)-নামক বিখ্যাত স্থানটিও সরস্বতীর উপরেই অবস্থিত। এই পৃথূদকের অপর দিকে যে-দেশ তাকেই বলিত উত্তরাপথ, আর এদিকে যে-দেশ তার নাম মধ্যদেশ।

সরস্বতীর আধুনিক নাম সারস্বতি। শতদ্রু নদীর পূর্বদিকে প্রবাহিত। হিমালয়ে উৎপন্ন হইয়া রাজপুতানার মরুভূমিতে বিলুপ্ত হইয়াছে। আর বর্তমান চিটাঙ্ নদীকেই প্রাচীন দৃষদ্বতী বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। চিটাঙ্ সারস্বতি ও যমুনার মধ্যে প্রবাহিত।

কুরুক্ষেত্র (৪৮)—কালিদাস নাম ধরিয়া কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ করেন নাই। তবে "ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং ক্ষেত্রম্" বলিয়া কুরুক্ষেত্রেরই নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন কুরুদেশ সরস্বতী হইতে গঙ্গা পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। কুরু-রাজধানী হস্তিনাপুর (মতান্তরে হাস্তিনপুর) বর্তমান মিরাটের নিকটে গঙ্গার উপরে অবস্থিত ছিল। ইন্দ্রপ্রস্থ (বর্তমান ইন্দ্রপৎ) আধুনিক

দিল্লীর নিকটেই যমুনার উপরে অবস্থিত ছিল। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী থানেশ্বরের কিছু দক্ষিণে (বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র পানিপথ হইতে চল্লিশ মাইল উত্তরে) একটি স্থানই প্রাচীন কুরুক্ষেত্র।

সরস্বতী (৪৯)—পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত দ্রষ্টব্য।

কনখল (৫০)—এখনও এই নামেই পরিচিত। হরিদ্বার (প্রাচীন নাম গঙ্গাদ্বার) হইতে দুই মাইল দূরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই স্থানেই গঙ্গা হিমালয় হইতে সমতল ভূমিতে অবতরণ করিতেছে। গঙ্গাদ্বার নাম হইতেও তাই বোঝায়। মহাভারতে (বন, ৮৪।২৭-৩০) গঙ্গাদ্বার ও কনখল তীর্থস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। কথাসরিৎসাগরেও কনখলের উল্লেখ আছে।

জাহ্নবী (৫০)—গঙ্গা। কালিদাস শুধু জহ্নু-কন্যা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ের পৌরাণিক প্রসঙ্গটি যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

যমুনা (৫১)—স্বনামখ্যাত নদী। প্রয়াগে গঙ্গার সহিত যমুনা সঙ্গত হইয়াছে। গঙ্গার জল শাদা, আর যমুনার জল কালো। প্রয়াগে শাদা ও কালো দুই ধারার মিলন হইয়াছে। এই শ্লোকে কালিদাস বলিতেছেন যে, কনখলের নিকটে গঙ্গার শুভ্র জলে যখন মেঘের কালো

ছায়া পড়িবে তখন যেন গঙ্গা অস্থানেই যমুনার সঙ্গ পাইয়া অতি সুন্দর দেখাইবে।

চরণন্যাস (৫৫)—হরিদ্বারের নিকটেই হিমালয়ের অন্তর্গত কোনো তীর্থস্থান। উইলসন্ অনুমান করিয়াছেন হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী 'হরকা পৈরী' নামক স্থানকেই এখানে চরণন্যাস বলা হইয়াছে (মেঘদূত, পৃঃ ৬২)। অধ্যাপক কে, বি, পাঠক বলেন, শম্ভুরহস্য-নামক পুস্তকে এই স্থানকে শ্রীচরণন্যাস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (মেঘদূত, পৃঃ ৯৬)।

প্রালেয়াদ্রি (৫৭)—হিমাদ্রি। প্রালেয়াদ্রি মানে প্রলয়গিরি নয়। প্রালেয় মানে হিম (পূর্ব্বমেঘ, ৩৯ সংখ্যক মূল শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সেইজন্যই হিমালয়কে প্রালেয়াদ্রি বলা হয়। প্রালেয় কথার সহিত প্রলয়ের কোনো সম্বন্ধ নাই।

ক্রৌঞ্চরন্ধ্র (৫৭)—হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তর-প্রান্তবর্ত্তী (উপতটম্) একটি পর্ব্বতের নাম ক্রৌঞ্চ। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় (১৪।২৪) এবং রামায়ণ প্রভৃতির অন্যান্য বহু প্রাচীন গ্রন্থে এই পর্ব্বতের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের আধুনিক পরিচয় দেওয়া দুষ্কর। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, উহা কৈলাস পর্ব্বত ও মানস সরোবরের দক্ষিণে এবং হিমালয়ের উত্তর সীমায় অবস্থিত। মেঘদূতের বর্ণনা হইতেও এই অনুমান হয়। একটি পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে পরশুরাম (ভৃগুপতি) কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেবের নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

কোনো সময়ে দেব-সেনাপতি স্কন্দের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া তিনি তীক্ষ্ণ শরাঘাতে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত ভেদ করিয়া সেই পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ইহাই ক্রৌঞ্চরন্ধ্র। কিন্তু আসল কথা এই যে, ক্রৌঞ্চরন্ধ্র হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়া তিব্বতে যাইবার একটি পাস্ বা গিরিসঙ্কট। বদরীনাথের কিছু উত্তরে হিমালয়ে "নিতি" নামে যে-গিরিসঙ্কট আছে তাকেই কেহ কেহ প্রাচীন ক্রৌঞ্চরন্ধ্র বলিয়া মনে করেন।

হংসদ্বার (৫৭)—বর্ষার আগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই রাজহংসরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে মানস সরোবরে চলিয়া যায় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মানস সরোবরে যাওয়ার সময় হংসরা পূর্ব্বোক্ত ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের ভিতর দিয়াই হিমালয় অতিক্রম করে বলিয়া উহার নাম হংসদ্বার।

কৈলাস (৫৮)—মানস সরোবরের কিছু উত্তরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ পর্ব্বত। এখনও তীর্থ-যাত্রীরা ইহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। কৈলাস হরপার্ব্বতীর আবাস বলিয়া বহু প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু যাঁরা কৈলাস-ভ্রমণ-বিবরণ লিখিয়াছেন তাঁরা কেউ সেখানে কোনো শিব-মন্দিরের উল্লেখ করেন নাই। কৈলাস-শিখরের চারদিকে চারটি বিহার আছে।

মানস (৬২)—হিমালয়ের উত্তরে কৈলাস-শিখরের একটু দক্ষিণে অবস্থিত বহু প্রসিদ্ধ

মনোহর হ্রদ। ইহা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বীরই পবিত্র তীর্থ। প্রতি বৎসর বহু যাত্রী ইহার তীরে সমবেত হয়। সিন্ধু শতদ্রু ও ব্রহ্মপুত্র, এই তিনটি বিখ্যাত নদী ইহারই নিকটে উৎপন্ন হইয়াছে। কৈলাস-গিরি ও মানস-সরোবর উভয়ই তিব্বতের অন্তর্গত।

অলকা (৬৩)—কৈলাসের কোলে কবি-কল্পিত নগরী ; কুবেরের রাজধানী। বস্তুত কৈলাসের উপর কোনো লোকালয় নাই। এই অলকা-নগরীতেই ধনপতি কুবের ও তাঁর অনুচর যক্ষদের আবাস বলিয়া প্রাচীন ভারতে বিশেষ খ্যাতি ছিল (মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৫৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

কালিদাস অলকাকে কৈলাসোৎসঙ্গশায়িনী ও "স্রস্তগঙ্গাদুকূলা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা হইতে বোঝা যায়, কৈলাস হইতেই গঙ্গার উৎপত্তি বলিয়া কালিদাসের ধারণা ছিল। বস্তুত প্রাচীন ভারতে সকলেরই এই ধারণা ছিল। ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে পূর্ণ পরিচয়ের অভাবই ঐ ধারণার মূল। আসলে কিন্তু গঙ্গা হিমালয় হইতেই ত্রিশূল ও নন্দাদেবী শিখরের নিকটে উৎপন্ন হইয়াছে, কৈলাস হইতে নয়। কৈলাস পর্ব্বতটাই অল্পাধিক কল্পনাসৃষ্ট। মেঘদূতের বর্ণনাতেও তা বোঝা যায়। মানসের "হেমাম্ভোজপ্রসবি" সলিলের বর্ণনাতেও মনে হয় যথেষ্ট পরিচয়ের অভাবে ঐ সব স্থান সম্বন্ধে কল্পনার প্রসার খুবই

বাড়িয়াছিল। অলকা-নগরী সবটাই কাল্পনিক।

গঙ্গা নদী অনেকগুলি স্রোতস্বিনীর সমবায়ে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সব স্রোতস্বিনীর একটির নাম অলকনন্দা। অলকনন্দার উৎপত্তিও হিমালয়ের মধ্যে অবস্থিত বিখ্যাত বদরিকাশ্রম হইতে দূরবর্ত্তী নয়। সুতরাং অলকানন্দাকেও অলকা-নগরী বা কৈলাস পর্ব্বতের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় না। কাজেই মেঘদূত এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত কৈলাস ও অলকার সংস্থান সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। মহাভারতের বনপর্ব্বে (১৪৫-১৫৬ অধ্যায়) কিন্তু কৈলাস-পর্ব্বতকে বদরিকাশ্রম হইতে অনতিদূরবর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

মানচিত্র

মেঘদূতে উক্ত নদী, পর্ব্বত, জনপদ প্রভৃতির প্রকৃত সংস্থান দেখাইবার জন্য একটি মানচিত্র দেওয়া হইল। ইহা বিশেষভাবে মেঘদূতের দেশ-সংস্থান নির্দ্দেশের জন্য রচিত হইলেও ইহাতে কালিদাসের যুগের উত্তর ভারতের অন্যান্য অনেক স্থানও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অবশ্য এই মানচিত্রটি যে তৎকালের উত্তর ভারতের ভৌগোলিক অবস্থার পূর্ণ পরিচয় দিতেছে, তা নয়। আর এমন কোনো কোনো স্থানও ইহাতে দেখানো হইয়াছে (যথা—ইন্দ্রপ্রস্থ,

হস্তিনাপুর ইত্যাদি) বা কালিদাসের সময়ের নয়, অথচ প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা বুঝিবার পক্ষে সহায়ক। মেঘ যে-সমস্ত নদী, পর্ব্বত, জনপদ প্রভৃতির উপর দিয়া গিয়াছিল তাদের নাম এবং মেঘের পথরেখা লাল কালিতে ছাপা হইল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

—